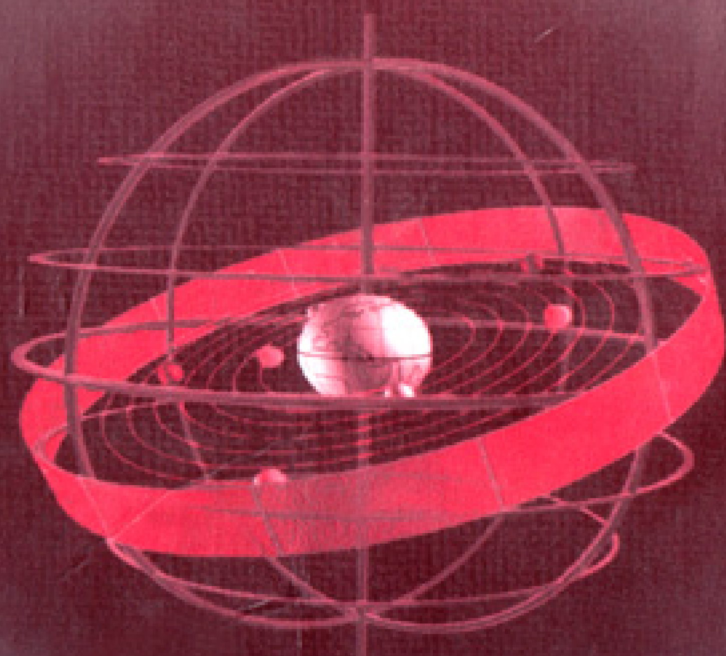
AKARSHIK ABISKARER GOLPA

Dr. Rubina Zaman

আকস্মিক আবিষ্কারের গল্প

ডক্টর রুবিনা জামান



আকস্মিক আবিষ্কারের গল্প

ডক্টর রুবিনা জামান



জিয়া সাহিত্য পর্ষদ | ঢাকা

সূচীপত্র



বিজ্ঞানী মেরী কুরী

জন্ম ঃ ৭ই নভেম্বর ১৮৬৭
মৃত্যু ঃ ৪ঠা জুলাই ১৯৩৪



"ঘৃণিত এই পৃথিবী থেকে আমি বিদায় নিতে চাই। ক্ষতি হবে খুবই সামান্য.." এ কথাগুলো লিখেছিলেন সপ্তদশ বর্ষীয়া প্রেমপাগল একটি তরুণী। কিন্তু বিজ্ঞান ও আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে—সুন্দরী তরুণীটি তাঁর প্রেমঘটিত দুঃখ ভুলে যান এবং সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পোল্যান্ডের ওয়ারশ'তে ১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বরে ম্যানিয়া স্কলোদোভস্কা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা ছিলেন পোল্যান্ডের কৃষিজীবী পরিবার। কিন্তু শিক্ষার প্রতি অনুরাগে তাঁরা কৃষি পেশা ত্যাগ করেন।

তাঁর পিতা ছিলেন দক্ষ একজন পিয়ানোবাদক। বাল্যেকালেই ম্যানিয়ার জীবনে দুঃখ নেমে আসে। মেরীর ১০ বছর বয়সে যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মা পরলোক গমন করেন।

সেই সময়ে পোল্যান্ড ছিলো 'জার' শাসিত রাশিয়ার কলোনী। পোলিশদের বিদ্রোহের প্রচেষ্টার প্রতিশোধরূপে পেট্রোগ্রাড সরকার তাঁদের উপর কঠিন বিধি-নিষেধ জারি করেন। ম্যানিয়ার পিতা তাঁর ইস্কুলের চাকুরি হারান। কারণ, পেল্যান্ডের স্বাধীনতার দাবিতে তিনি ছিলেন প্রতিবাদমুখর। এই পরিস্থিতিতে অবশিষ্ট চারটি সন্তানের (তাদের একটি সন্তান টাইফয়েডে মারা যায়) ভরনপোষণের জন্য তিনি একটি বোডিং ইস্কুল খোলেন। এই প্রচেষ্টাও বেশী সফল হয়নি, অবশ্য কোনোক্রমে পরিবারের ভরণপোষণ চলে যায়।

১৮৮৩ সালে হাই ইস্কুল সমাপনী পরীক্ষায় ম্যানিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। পদক লাভ স্কলোদোভস্কী পরিবারের পুরনো ঐতিহ্য। পরিবারে পদক প্রাপ্তদের মধ্যে ম্যানিয়া হলেন তৃতীয়। আর্থিক অবস্থা ফিরাতে ব্যর্থ হয়ে অধ্যাপক স্কলোদোভস্কী তাঁর সন্তানদের কৃতিত্বের মধ্যে আনন্দ ও সুখ খুঁজে পান। হাই ইস্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর ম্যানিয়াকে এক বছরের জন্যে দেশের বাড়িতে পাঠানো হয়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা তাঁর পিতাকে ব্যাকুল করে রেখেছিলো। গ্রামের বাড়িতে দীর্ঘ অবকাশ যাপন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মের জন্যে ভালো হতে পারে—এটা তাঁর পিতার ধারণা।

পোল্যান্ডের পল্লীনৃত্যে যথেষ্ট শক্তি সামর্থের প্রয়োজন হতো। এই নাচ সূর্যাস্তে শুরু হতো, সারারাত চলতো, পরবর্তী দিনও নাচ অব্যাহত থাকতো এবং তার পরের রাত্রিতে শেষ হতো। ম্যানিয়াও নাচকে খুবই ভালোবাসতেন।

তাঁর অবকাশের দিন এক সময় শেষ হয়ে গেলো। তিনি ওয়ারশ'তে ফিরে এলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হলো। কিন্তু অর্থছাড়া তিনি কি করে প্যারিসের সোরবোনে যেতে পারেন? বড়ো বোন ব্রোনিয়া'র সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনার পর দুই বোন মিলে একটা পথ বের করলেন। ম্যানিয়া চাকুরী নেবে এবং ব্রোনিয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সাহায্য করবে। তার পর ব্রোনিয়া চাকুরী নিয়ে ম্যানিয়ার পড়াশোনার খরচ যোগাবে। যথা চিন্তা—একদিন হলোও তাই।

একজন অভিজাত রাশিয়ানের গৃহে গভর্নেস্ ও শিক্ষিকার চাকুরি লাভ করেন ম্যানিয়া। কিন্তু তাঁর গৃহকর্ত্রী ছিলেন অসহিষ্ণু এবং বদরাগী, তাই তাঁর কপালে চাকুরি বেশিদিন স্থায়ী হলো না। সৌভাগ্যবশতঃ ম্যানিয়া পূর্বের চাইতে ভালো পরিবেশে অন্য একটি চাকুরী লাভ করেন। এই পরিবারের বড়ো ছেলেটি ছিলেন ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছুটিতে ছেলেটি বাড়ি আসেন এবং সহজেই সুন্দরী গভর্নেসের প্রেমে পড়েন। ছেলেটি নাচতে পারতো এবং তাঁর কথাবার্তাও ছিলো পন্ডিতদের মতো। নিঃসঙ্গ ম্যানিয়া প্রেমের আবেদনে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন। কিন্তু ছেলের মা এই বিয়েতে বাঁধ সাধলেন। তিনি কিছুতেই তাঁর ছেলেকে একজন গভর্নেস্ বিয়ে করতে দেবেন না। তখন ম্যানিয়া ঐ গৃহ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং একটি চিরকুটে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন, —"ঘৃণিত এই পৃথিবী থেকে আমি বিদায় নিতে চাই। ক্ষতি হবে খুবই সামান্য..।" এরপর ম্যানিয়া অন্যত্র শিক্ষকতার চাকুরি নেন এবং সোরবোনে বড়ো বোনের নিকট টাকা পাঠাতে থাকেন। অবশেষে একদিন ম্যানিয়ার পালা এলো। বড়ো বোন প্যারিস থেকে শুধু মেডিক্যাল ডিগ্রিই নিয়ে এলেন না, সাথে একজন সহপাঠী মেডিক্যাল ছাত্রকে ভালোবেসে বিয়ে করে নিয়ে এলেন।

২৩ বছর বয়সে তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবের ছোঁয়া পেলো। মেরী সোরবোনের বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। চার চারটি বছর ধরে তিনি কাজ এবং পড়াশোনা চালিয়ে যান। হঠাৎ করেই তিনি রোগের শিকার হলেন। তিনি একটা চিলেকোঠায় থাকতেন এবং সেখানে তাপ ব্যবস্থা ছিলো না। খাদ্যের জন্য তাঁর অর্থ অত্যন্ত সামান্যই ছিলো। তাঁর

খাবার মূলতঃ রুটি, মাখন এবং চা। একদিন তো পুরো ২৪টি ঘন্টা তিনি মূলো খেয়ে কাটিয়ে ছিলেন। তাঁর খাদ্যের তালিকায় মাংস এবং ডিম খুব কমই স্থান পেতো।

কিন্তু তিনি বেঁচে রইলেন এবং বেঁচে থেকে গণিত, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও কাব্য অধ্যয়ন করলেন। অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে তিনি রাসায়নিক গবেষণাগারের বোতল পরিষ্কারের কাজ করতেন। পদার্থ বিজ্ঞানে ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি স্টার মার্কসহ প্রথম স্থান লাভ করেন এবং পরবর্তী বছরেই গণিতে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে মেরীর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। প্রেমের প্রথম নীল অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে লুকায়িত থাকে। সুন্দরী,স্বর্ণকেশী, নমনীয় আকৃতির মেরী যাকে আমরা ম্যানিয়া বলে জেনেছি সে নিজের মধ্যেই মগ্ন ছিলেন।

২২ বছর বয়সে পিয়েরে কুরী লিখেছিলেন,— "প্রতিভাময়ী নারী খুবই বিরল এবং নারীরা সাধারণতঃ বিজ্ঞান সাধনায় সক্রিয় প্রতিবন্ধক।"

পিয়েরের বয়স যখন ৩৫ তখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আরো জোরদার হলো। তিনি বিদ্যুৎ এবং চুম্বকতত্ত্ব সম্পর্কে এক জটিল গবেষণা করছিলেন। অধ্যাপক পল শুৎজেনবার্জারের গবেষণাগারে তিনি তাঁর ভ্রাতা জ্যাকুইসকে নিয়ে কাজ করছিলেন। পিয়েরে কুরী মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি "পিজো-বিদ্যুৎ" সূত্র উদ্ভাবন করে বিজ্ঞান ভূবনে সম্মানিত আসনে উন্নীত হয়েছিলেন। রেকর্ড প্লেয়ারের স্বচ্ছ আওয়াজের সঙ্গে এই পিজো-বিদ্যুতের সূত্র জড়িত। রেকর্ড প্লেয়ারের স্বচ্ছ কাঁচের চাকতি ঘোরালে অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

পিয়েরে ও মেরী সর্বপ্রথম অধ্যাপক কোভ্যালস্কীর গৃহে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন। কোভ্যালস্কী ছিলেন একজন পোলিশ বিজ্ঞানী এবং তিনি সে সময়ে প্যারিস সফর করছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়েই কথাবার্তা হয়েছিলো। মেরী তাঁর সঙ্গে পুররায় দেখা করার জন্যে পিয়েরেকে অনুরোধ করেন। শুধু বিজ্ঞান নিয়েই কি কথা হয়েছিল? নাহ, আলোচনার ফলে মেরী পিয়েরের সঙ্গে অধ্যাপক শুৎজেনবার্জারের গবেষণাগারে কাজ করার অনুমতি লাভ করেন। পরবর্তী এক বছরের মধ্যেই ম্যানিয়া স্কলোদোভস্কা মেরী কুরী নামে পরিচিত হন।

পিয়েরে লিখেছিলেন,—" প্রতিভাময়ী নারী বিরল। ..." সেই বিরল নারীরই সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর পত্নী ছিলেন একজন প্রতিভাময়ী নারী। মেরী সানন্দে তাঁর স্বামীর সঙ্গে গবেষণাগারে চুম্বক ও বিদ্যুতের সমস্যাবলী নিয়ে কাজ করতে থাকেন।

জার্মানীতে বিজ্ঞানী উইলহেলম্ রান্টজান একটি নতুন রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন। এই রশ্মি অধিক তীক্ষ্মশক্তি সম্পন্ন। ১৮৯৬ সালের জানুয়ারীতে বিশ্ব বিজ্ঞানী সংস্থার নিকট তিনি এই রশ্মির কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি এর নাম দেন 'এক্স রশ্মি' এবং প্রমাণ করেন যে, এই রশ্মি কঠিনতম পদার্থ ভেদ করতেও সমর্থ। এদিকে ফ্রান্সে অধ্যাপক হেনরী বেকুয়ারেল অণুপ্রভার সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছিলেন—এটা হলো কতোগুলো পদার্থ

অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করে। কিন্তু কেনো? পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তার মনে এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, অপরিশোধিত খনিজ পদার্থ ইউরেনিয়াম পিচ-ব্লেন্ডের মধ্যে ইউরেনিয়াম ছাড়া অন্য আরো কিছু ভিন্ন পদার্থ আছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে মেরী কুরীর দক্ষতায় অধ্যাপক বেকুয়ারেল অনেক আগেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এই সমস্যাটা কুরীর নিকটেই তুলে ধরলেন। যে উপাদানটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন, তা কোনো পরিচিত উপাদান হতে পারে না! এটা নিশ্চয়ই নতুন কোন উপাদান হবে। স্বামী-স্ত্রী তখন অন্যসব কাজের চিন্তা বাদ দিয়ে এই রহস্য উদ্‌ঘাটনেই উঠে পড়ে লাগলেন।

পিচ-ব্লেন্ড অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ পদার্থ এবং এটা অস্ট্রিয়া ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এখন তাদের ভাবনা বিনা পয়সায় কি করে কিছুটা পিচ-ব্লেন্ড পাওয়া যেতে পারে? তাঁরা ভাবলেন যে, পিচব্লেন্ডে এই অজ্ঞাত উপাদান থেকে থাকলে ইউরেনিয়াম বের করে নেওয়ার পরও উচ্ছিষ্ট অংশে এই উপাদান থেকে যাবে। তাঁরা তখন অস্ট্রিয়া সরকারের সাথে যোগাযোগ করলেন। অস্ট্রিয়া সরকার পিচ-ব্লেন্ডের উচ্ছিষ্ট অংশ শুধুমাত্র পরিবহন খরচের বিনিময়ে তাঁদের পাঠাতে রাজী হলেন।

একদিন পিচ-ব্লেন্ডের কয়েক টন উচ্ছিষ্ট পুরো জাহাজ ভরে তাঁদের গবেষণার জন্যে প্রেরণ করা হলো। এর পর শুরু হলো বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অতি রোমাঞ্চকর গবেষণা পর্ব। কুরী দম্পতি অপরিশোধিত খনিজ পদার্থকে পরিশোধন করতে লেগে গেলেন। একটা বিরাট পাত্রে তাঁরা এগুলোকে জ্বাল দিতে লাগলেন। ধোঁয়ার উৎপাত সহ্য করা সম্ভব না হওয়ায় একদিন তাঁরা তাঁদের কর্মকান্ড বাসগৃহের পেছনের আঙিনায় স্থানান্তরিত করেন। এবং তাঁরা সর্বক্ষণ গবেষণা অব্যাহত রাখেন।

১৮৯৬ সালের পুরোটা শীতকাল মেরী দম্পতি তাঁদের ময়লা স্টোভ নিয়ে পরিশ্রম করেই চলছিলেন। প্রচুর খাঁটুনির ফলে মেরী নিমোনিয়ায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। পিয়েরে চুল্লী গুতিয়েই চললেন। এদিকে তিন মাস রোগ ভোগের পর মেরী কেতলী-কড়াইয়ের রাজ্যে আবার ফিরে এলেন।

১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে মেরীকে দ্বিতীয়বার শয্যাগ্রহণ করতে হয়। তখনও তিনি ময়লা সব আবর্জনা পরিশোধন এবং পরিশুদ্ধ করে চলেছিলেন। তবে এবারে তার শয্যা গ্রহণ অবশ্য মাতৃত্ব লাভের কারণে। মেরী একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিলেন। তাঁর কন্যার নাম রাখা হলো, 'আইরিন'। এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যেই মেরী পুনরায় গবেষণাগারে ফিরে গেলেন। শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় তিনি কি একটা নতুন চিন্তা করেছিলেন, এবার তিনি সেটার পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। একবার মনে হলো যে, বেবী আইরিনের দেখাশোনার জন্যে তাঁকে গবেষণাগারের কাজ গুঁছিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সদ্য বিপত্নীক ভাই কুরী পিয়েরেও মেরীর সঙ্গেই বসবাসের জন্যে চলে এলেন। এবং বোনের সব কথা শুনে তিনি আনন্দে শিশু আইরিনকে দেখাশোনা করতে রাজী হলেন। এতে তিনি নিজেও বেশ শান্তি খুঁজে পেলেন।

মেরী পিচ-ব্লেন্ড পরিশোধনের কাজে ফিরে গেলেন। দু'বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের ফল স্বরূপ পেলেন সামান্য পরিমাণ 'বিসমাথ যৌগিক' উপাদান । কিন্তু এই বিসমাথ, ইউরোনিয়াম থেকে ৩০০ গুণ অধিক কার্যকর । ছবি তোলার ফিল্মে বিসমাথ আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করে । বিসমাথের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁদের প্রাপ্ত উপাদানের বাইরেও কিছু রয়েছে একথা ভেবে আরো নতুন কিছুর সন্ধানের জন্যে মেরী আবারও গবেষণাগারে ফিরে গেলেন।

১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে তিনি এক নতুন উপাদান আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির নাম অনুসারে তিনি এই নতুন উপাদানের নাম রাখলেন, 'পোলোনিয়াম'। কিন্তু কুরী দম্পতি এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ, তাঁদের মনে হলো, পোলোনিয়াম আহরণের পরেও অবশিষ্ট পদার্থ পোলোনিয়াম থেকে অধিক উজ্জ্বল থেকে যায়।

হয়তো আরো ও ভিন্ন নতুন কোন উপাদান রয়ে গেছে, তাই পরিশোধন এবং স্বচ্ছতা রক্ষার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে কিছুদিন পর আরো এটা নতুন উপাদন পাওয়া গেলো। এই নতুন উপাদান হলো সামান্য পরিমাণ স্ফটিক। তাঁরা এই নতুন পদার্থটির নাম দিলেন, 'রেডিয়াম।'

রেডিয়াম এক অদ্ভুত উপাদান। রেডিয়াম ইউরেনিয়াম থেকে ১০ লক্ষ গুণ অধিক তেজস্ক্রিয়তা শক্তি সম্পন্ন । ছবি তোলার ফিল্মের আলোক সচেতন উপাদানকে রেডিয়াম স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। এমন কি, ফিল্ম আলো প্রতিরোধক কাগজে আবৃত থাকলেও এই অঘটন ঘটে যায়। রেডিয়াম বায়ুতে গ্যাসের মলিকিউলকে বিদ্যুতায়িত করে— অর্থাৎ এটা গ্যাসকে বিদ্যুৎ বহনের উপযোগী করে। অন্যান্য যৌগিক পদার্থের সাথে মিশ্রণের ফলে রেডিয়াম যৌগিক ফ্লোরেসেন্স উৎপন্ন করে। কোনো কোনো হাত ঘড়ির চিহ্ন ঔজ্জ্বল্যের কারণ একটাই, তাতে সামান্য পরিমাণ রেডিয়াম রয়েছে। রেডিয়াম বিকিরণ বীজের উদ্‌গমন বন্ধ করতে, রোগ জীবাণু ধবংস করতে, এমন কি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও হত্যা করতে পারে এক মুহূর্তে।

বিকিরণ মাংসপেশী নষ্ট করতেও সক্ষম। তাই ক্যান্সার এবং নির্দিষ্ট অনেকগুলো চর্মরোগের চিকিৎসায় আজকাল রেডিয়াম ব্যবহৃত হয়। এটা ক্রমাগত তাপ নিঃসরণ করে। রেডিয়াম নিজের থেকেই এই তাপ বিকিরণ করে। অর্থাৎ রেডিয়াম সহজ পরমাণুতে নিজেকে বিলিয়ে দেয় এবং এই ভাবে তেজ নিঃসৃত করে দেয়। নিঃসন্দেহে রেডিয়াম যুগ-যুগান্তরের এক অনন্য উপাদান এ কথাটি বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বময়।

এবার সমস্ত পৃথিবী কুরী-দম্পতির পেছনে লেগে গেলো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁদের নিকট বিভিন্ন প্রস্তাব আসতে লাগলো। কিন্তু তাঁরা তাঁদের আবিষ্কারকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে অস্বীকার করলেন। এই কীর্তির জন্যেই

বেকুয়ারেলের সঙ্গে মিলিত ভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কারের অর্থ দিয়ে তাঁরা তাঁদের পুরনো ঋণ শোধ করেন। পিচ-ব্লেন্ড নিয়ে পরিশোধন ও পরীক্ষা - নিরীক্ষার ক'বছরে তাঁদের ধার-দেনা করতে হয়েছিলো প্রচুর।

নোবেল প্রাপ্তির পরে পিয়েরে কুরী সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অত্যন্ত সুসজ্জিত গবেষণাগার ব্যবহারের সুযোগও লাভ করেন একই সাথে।

১৯০৪ সালে দ্বিতীয় কন্যা 'ইভ' জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁরা পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশী সুখী দম্পতিরূপে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক নির্মম দুর্ঘটনা এই সুখী যুগল জীবনের অবসান ঘটায়।

১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল পিয়েরে কুরী বিজ্ঞান সভা থেকে ঘরে ফেরার সময় হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়েন। একটা ঘোড়ার গাড়ি আচমকা এসে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং পরক্ষণেই বিপরীত দিক থেকে আগত একটা ভারী গাড়ি তাঁর উপর দিয়ে চলে যায়। রাজপথে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভগ্ন হৃদয় মেরী পাথর হয়ে গেলেন। গবেষণাগারে কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই তিনি সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করলেন। রাতে তিনি স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশ্য পত্র লিখে সময় কাটাতেন। এইসব পত্রে তিনি দিনের গবেষণাগারের সমস্ত কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে থাকলেন। ফ্রান্স সরকার সকল পুরনো ঐতিহ্য মুছে দিয়ে মেরীকে পিয়েরের শূন্য 'পদার্থ বিজ্ঞানের সম্মানী আসন' গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন।

এতে কোনো কোনো বিজ্ঞানী হিংসায় প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন। একজন নারী পাবেন এই সম্মানীয় আসন? অসম্ভব, অচিন্তনীয় ! তাঁরা আরো বললেন,—'পিয়েরেই তো ছিলেন আসল ব্যক্তি, মেরীতো মাত্র স্বামী-কে কিছু মাত্র সহায়তা করেছেন শুধু।'

এক সময় মেরী কুরী প্রমাণ করলেন—না, এককভাবে তিনিও তাঁর স্বামীর মতোই কৃতি বিজ্ঞানী । ১৯১০ সালে মেরী কুরী একক প্রচেষ্টায় বিশুদ্ধ অবস্থায় রেডিয়ামকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন। গলিত রেডিয়ামের ক্লোরাইডের ভিতর দিয়ে তিনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত করেন এবং পারদপূর্ণ ঋনাত্মক ইলেক্ট্রোডে পারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং তিনি চুলোয় জ্বাল দিয়ে পারদ মুক্ত করে ফেলেন। দেখা গেলো মুক্ত উপাদান রেডিয়াম নিচে পড়ে রয়েছে । এই একক কৃতিত্বের জন্যে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন বিজ্ঞানী মেরী কুরী।

১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই এই কৃতী মহিলা বিজ্ঞানী পরোলোক গমন করেন। বহু বছর ধরে বিকিরণের মধ্যে কাজ করায় তাঁর শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো এক এক করে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কর্মের প্রতি তিনি এতোটা নিবেদিত ছিলেন যার ফলে তিনি বুঝতে পারেননি কী ঘটতে যাচ্ছে।

তাঁর আবিষ্কৃত রেডিয়ামই তাঁকে জয় করে নিয়ে যায় নিয়তির বিধান তাঁর চিরদিনের বাসভূমে।



লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি

জন্ম ঃ ইতালী ১৪৫২
মৃত্যু ঃ প্যারিস ১৫১৯



তরুণ এক যুবক। মাথা ভর্তি সোনালি চুল। একদিন ফ্লোরেন্সের এক পাহাড় চূড়োয় খাঁচা থেকে কতোগুলো পাখি ছেড়ে দিলেন। পাখিগুলো ছিলো দোয়েল। খাঁচা থেকে মুক্ত পাখিগুলো খোলা আকাশের বুকে উড়তে লাগলো। ইচ্ছে মতো আকাশে বিচরণ করতে লাগলো। আর যুবকটি একমনে তা দেখছেন তো দেখছেনই । এই যুবকটিই হচ্ছেন,— বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি। মুক্ত আকাশে পাখির বিচরণ মনোযোগ সহকারে প্রত্যক্ষ করতে করতে তিনি খাতায় কি সব নোট লিখে নিলেন।

পাখির উড্ডয়ন তিনি পর্যবেক্ষন করেছিলেন ,কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে উড্ডয়নে এই একই পন্থা মানুষের বেলাও প্রযোজ্য হতে পারে । গবেষণালব্ধ তথ্য সবার থেকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সাংকেতিক লিপিতে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন। তখন ইতালীর অনেকেই তাঁকে একটা আস্ত পাগল মনে করতো । মানুষ আবার উড়বে! এটাও সম্ভব! তাই সাধারণ মানুষের হাসির খোরাকে ইন্ধন যোগাতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। এজন্যেই তিনি তখন সাঙ্কেতিক ভাষায় তাঁর পর্যবেক্ষণ তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করতেন।

অনেক ঐতিহাসিকই লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিকে তাঁর সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠতম প্রয়োগিক বিজ্ঞানী বলে মত প্রকাশ করেছেন। এবং সর্বকালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। (The last supper) 'শেষ ভোজ' ক্রুসেফাইড হওয়ার

পূর্বে যীশু খ্রীষ্টের শেষ আহারপর্ব এবং 'মোনালিসা'র স্রষ্টারূপেই সম্ভবতঃ তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি বহু সংখ্যক বিশ্বখ্যাত চিত্রাঙ্কন করেছেন। এছাড়া তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধজ্ঞান এবং তাঁর আবিষ্কারসমূহ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন; তাঁর হাতে লিখিত পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও উপরে হবে, তিনি লিখেছেনও খুব সুক্ষ্ম করে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজনে লেখার ফাঁকে ফাঁকে আবার সুন্দর-সুন্দর চিত্র এঁকে রেখেছেন। গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে তিনি সব কিছুই সাঙ্কেতিক লিপিতেই লিপিবদ্ধ করেছেন আজীবন।

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি'র বহুবিধ প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার জন্যে বলতে হয়—তিনি ছিলেন একজন আবিষ্কারক, সামরিক ও বেসামরিক ইঞ্জিনিয়ার, জ্যোতির্বিদ, শারীরবিদ, ভূতাত্ত্বিক, এবং আজকের বিজ্ঞানীদের পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন একক ও অনন্য। শিল্পকলার অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়েন, আর তাঁর বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীই সম্ভবতঃ তাঁকে শিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করেছে বেশী।

১৪৫২ সালে ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরের নিকটবর্তী 'ভিঞ্চি' নামক গ্রামে লিওনার্দো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সামান্য গ্রাম্য গেরস্থের কর্মচারী, মাতা ছিলেন গ্রাম্য সরাইখানার সামান্য চাকরানী। তাই পিতামহের সঙ্গেই তাঁর বাল্যকাল পুরোটা অতিবাহিত হয়।

ইস্কুল জীবনেই লিওনার্দো নিজ প্রতিভার পরিচয় দেন। ছোট্ট বালক লিওনার্দো ইস্কুলে অঙ্কের কঠিন সমস্যাগুলো সমাধান করে দিতেন অতি সহজেই। একই সঙ্গে তিনি চিত্রাঙ্কনেও উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় দেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি শিক্ষানবিসরূপে সর্বকালের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী আঁদ্রেয়া দেল ভেরোশিও'র সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর নিকট লিওনার্দো কাঠ, মার্বেল এবং ধাতব পদার্থের উপর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি শিক্ষালাভ করেন। কিশোর বালক লিওনার্দোর প্রতিভায় ভেরোশিও আশ্চর্য হয়ে যান এবং তাঁকে ল্যাটিন, গ্রীক, দর্শন, অঙ্ক ও শরীর ব্যবচ্ছেদ শাস্ত্র অধ্যায়নের জন্যে পরামর্শ দেন। ভেরোশিও'র মতে—'সত্যিকার দক্ষ শিল্পী হওয়ার জন্যে লিওনার্দোকে এসব বিষয় অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে এবং হলোও তাই।

২৬ বছর বয়সে লিওনার্দোর শিক্ষানবিশী শেষ হয় এবং তাঁকে শিল্পী সংঘের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে নিজ পৃষ্ঠপোষক বেছে নেয়ার সুযোগ লাভ করেন। লিওনার্দো বিশেষ এক ধরনের বাদ্যযন্ত্রও তৈরী করেছেন। যন্ত্রটা হচ্ছে ঘোড়ার মস্তকের আকার বিশিষ্ট এক বিশেষ ধরনের বীণা। এর দাঁতের সাহায্যে বিশেষ-বিশেষ সুর বাজানো যেতো। এই নতুন বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করে লিওনার্দো মিলানে'র তদানীন্তন শাসক ডিউক ল্যুদোভিকো-এর স্ফোর্জার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সে সময় ইতালীর বিভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্তা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলো। তাই সমরাস্ত্রের নকশা তৈরীর জন্যে লিওনার্দো নতুন কর্মে মন দিলেন। ডিউকের

দরবারে থাকতেই তিনি মহামারী বিধ্বস্ত শহরগুলো পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও নক্‌শা তৈরী করেন। তিনি নগর পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার গুরুত্ব অবলোকন করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি নগর পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকগুলো পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনোটিই গৃহিত হয়নি। ডিউকের নির্দেশে তাঁর একমাত্র কাজ হলো "শেষ ভোজ" চিত্রটি অঙ্কন করা। সান্তা মেরিয়া'র ডাইনিংরুমের জন্যে উপহার প্রদানের উদ্দেশ্যে ডিউক তাঁকে এই চিত্রাঙ্কনের জরুরী নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মিলানে থাকতেই তিনি শরীর-ব্যবচ্ছেদ শাস্ত্রে উৎসাহী হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি তদানীন্তন সময়ের খ্যাতনামা চিকিৎকদের শরণাপন্ন হন এবং তাঁদের শরীর-ব্যবচ্ছেদ কাজ করার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন। তার ফলে বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ক্ষেত্রে তিনি শরীর-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত কতকগুলো অনন্য সাধারণ চিত্রও অঙ্কন করেছিলেন।

একদিন ফরাসীরাজ ডিউক লুদোভিকো স্ফোর্জারকে পরাজিত ও গ্রেফতার করেন। লিওনার্দো ডিউকের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন। এই সঙ্কটকালে সমরাস্ত্র সম্পর্কিত তাঁর নতুন নতুন আবিষ্কারগুলো ভেনিসের কর্তৃপক্ষকে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি ভেনিস যাত্রা করেন। ডুবুরির পোশাক এবং ডুবো জাহাজের পরিকল্পনাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ভিন্ন আরো কয়েকটি বিষয়সহ এ দুটো পরিকল্পনা সম্পর্কেও তিনি তাঁর নোট বইতে বিস্তারিত বিশ্লেষণ তখনও করেননি। অবশ্য এর সপক্ষে কারণটিও তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন,—'মানুষের মন্দ প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি সমান অবহিত। তাই এগুলোর নির্মাণকৌশল প্রকাশ করলে মহাসমুদ্রে হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্যে এগুলো ব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে প্রচুর।'

এরপর লিওনার্দো স্বল্পকালের জন্যে চেযারে বর্জার দরবারে মানচিত্র অঙ্কনকারীর চাকুরি লাভ করেন। বর্জা ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক। সমগ্র ইতালী বিজয়ই ছিলো তাঁর একমাত্র ইচ্ছা। টাসক্যানী ও আমব্রিয়ার মানচিত্র অঙ্কনের জন্যে তিনি লিওনার্দোকে নিযুক্ত করেন। লিওনার্দো নিজেই জরিপ ও পরিমাপ করে এসব মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

১৫০০ সালে লিওনার্দো নিজ জন্মভূমি ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন। তারপর ছয়-ছয়টি বছর তিনি ফ্লোরেন্সেই বসবাস করেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো। এই সময়েই তিনি তাঁর বিশ্ব নন্দিত চিত্র "মোনালিসা" অঙ্কন করেন। 'মোনালিসা'র আকর্ষণীয় হাসি এখনো রহস্যের মায়াজাল বিস্তার করে আছে পৃথিবীর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার হৃদয়ে। প্যারিসের লুভার জাদুঘরে 'মোনালিসা' চিত্রটি আজো হাজার হাজার শিল্পমনস্ক মানুষকে আনন্দ দান করে চলেছে।

রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখ সমকালীন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তখন ভ্যাটিকান থেকে সিসটাইনের উপাসনালয়ের চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত ছিলেন। লিওনার্দোও তখন রোমে গেলেন। কিন্তু তিনি কোনো কাজ পেলেন না। শরীর-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত চিত্র অঙ্কনের

জন্যে তিনি কিছুটা উপেক্ষিতও হলেন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি মাতৃভূমি ইতালী ত্যাগ করেন এবং চিরদিনের মতোই ত্যাগ করেন। এবার তাঁর যাত্রা প্যারিসের দিকে। জীবনের বাকি ক'টি বছর তিনি প্যারিসের রাজ দরবারেই কাটিয়েছেন।

শিল্পী ও চিত্রকররূপে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি বিশ্বে সুপরিচিত। তাঁর চিত্রসমূহ এখনো পর্যন্ত সম্মানের সাথে সুরক্ষিত আছে। এসব চিত্র তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার অমর প্রতিফলন। কিন্তু বিজ্ঞানী ও আবিষ্কর্তা লিওনার্দোর পরিচয় পুরোপুরি দেয়া কঠিন। সমকালীন যুগে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। তাঁর যুগকে পেছনে ফেলে তিনি অনেক অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা এবং পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ সম্ভব ছিলো। কিন্তু বর্তমান থেকে তিনি এতো বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পক্ষে অন্যদের থেকে খুব বেশি সমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিলো না। তাঁর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে—তিনি প্রচুর কাজের অর্ডার গ্রহণ করতেন,—কিন্তু সময় এবং অস্থির চিত্ততার জন্যে ঠিক সময়ে সেগুলো শেষ করে দিতে পারতেন না।

তাঁর আবিষ্কৃত জিনিষ সমূহ বহুমুখী এবং চিত্তাকর্ষক। তাঁর আবিষ্কৃত মেশিনগানকে স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত মার্কিন 'গ্যাটলিং' গানের (Gatling gun) আদিরূপ বলা হয়। লিওনার্দোর উদ্ভাবিত বন্দুক ছিলো একাধিক নল বিশিষ্ট এবং ত্রিমুখী কার্যের উপর আবিষ্কৃত। একটা নল দিয়ে গুলি বর্ষণের সময় দ্বিতীয়টায় বারুদ ভরতি করা যেতো এবং তৃতীয়টাকে ঠান্ডা হাওয়ার সময় দেওয়া হতো। তাঁর তৈরী যুদ্ধ গাড়ির সঙ্গে একটা চলমান বেদী সংযুক্ত থাকতো এবং সেখানে বারুদ বোঝাই কামান রাখা হতো। গাড়ির চারটে আলাদা চাকা থাকতো এবং যেকোনো দিকে গাড়িটি ঘোরানো যেতো। অবশ্য মানুষই গাড়ি হাতে টেনে চালিয়ে নিতো। কারন, তখনো যন্ত্রচালিত গাড়ির উদ্ভাবন হয়নি।

ডুবুরির পোশাক এবং ডুবোজাহাজের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এছাড়াও তিনি দুই কাঠামো বিশিষ্ট এক ধরনের যুদ্ধ জাহাজের পরিকল্পনা করেছিলেন। এতে বাইরের খোলসটা শত্রুর গুলীতে ফুঁটো হয়ে গেলেও ভেতরে বিকল্প কাঠামো থাকায় জাহাজ নিরাপদ ও ভাসমান থাকবে।

আজকের বিজ্ঞানের যুগে আমরা যাকে যান্ত্রিকীকরণ বলে আখ্যায়িত করে থাকি, সে সম্পর্কেও লিওনার্দো সমানভাবে সক্রিয় ছিলেন। বায়ুর গতি পরিমাপের উদ্দেশ্যে তিনি 'এনিমোমিটার' (Anemometer) যন্ত্রের নমুনা তৈরী করেন। যন্ত্রটির শীর্ষদেশে একটা বাতশকুন [Vane] স্থাপিত ছিলো, যা বাতাসের গতিবেগের সঙ্গে সহজেই ঘোরতো এবং এর মাধ্যমেই বায়ুবেগের পরিমাপ গ্রহণ করা যেতো অতি অনায়াসে।

লিওনার্দোই সর্বপ্রথম ঘন্টা এবং মিনিট উভয়ের সমন্বয়ে ঘড়ি তৈরী করেন। তাঁর ঘড়ির গতি-নিয়ামক এবং চাপের সাহায্যে চালিত হতো।

আজকের দিনের প্রতিটি মোটর গাড়িতে 'অডোমিটার' যুক্ত থাকে। গাড়ি কতোটুকু পথ অতিক্রম করলো তা অডোমিটার থেকে জেনে নেয়া যায়। চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই

অডোমিটার কাজ করে এবং মাইলের হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়া যায়। লিওনার্দোর যুগে মোটর গাড়ি ছিলো না। কিন্তু তাঁর সময়ে মানচিত্র অঙ্কনের জন্যে দূরত্বের হিসাব মাপা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে অডোমিটার তৈরী করেন। মানুষ চালিত গাড়ির চাকার সঙ্গে সেটা সংযুক্ত থাকতো। চাকা চলার সঙ্গে সঙ্গে খাঁজযুক্ত অডোমিটারে প্রতিক্রিয়া শুরু হতো এবং চিহ্নিত গোলক ডায়ালের উপর মাইলের সঠিক হিসাব বুঝে নেয়া যেতো।

লিওনার্দোর আবিষ্কৃত অনেকগুলো যন্ত্র আজকের দিনেও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ঠিক সাবেকী পদ্ধতিতেই। অবশ্য এটা সত্য যে, যন্ত্রগুলোকে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। যেমন কাঠের পরিবর্তে আজকাল ইস্পাতের দ্বারা যন্ত্রগুলো তৈরী হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্র নির্মাণের সূত্রটা লিওনার্দো'রই আছে। ভার উত্তোলনের জন্য তিনি ঠিক আধুনিক যান্ত্রিক ভার উত্তোলনযন্ত্র জ্যাকের অনুরূপই একটা যন্ত্র তৈরী করেন। মোড় ঘোরার সময় গাড়ির এক এক চাকাকে এক এক ধরনের গতি প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ব্যাসের খাঁজযুক্ত চাকার প্রচলন করেন। এর ফলে বাঁক ঘুরতে বা বক্র এক চাকা অন্য চাকার তুলনায় জোরে ঘোরানো যেতো। তাঁর এই পদ্ধতি আধুনিক মোটর গাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হয়েছে।

আধুনিক যন্ত্রশিল্প পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, আজকের দিনের স্ক্রু কাটিং এবং ফাইল কাটিং মেশিন লিওনার্দো আবিষ্কৃত ঐ জাতীয় যন্ত্র থেকে খুব বেশী আলাদা কিছুই নয়।

জলপ্রবাহ সম্পর্কিত বিষয়াদিতে লিওনার্দো বিশেষভাবে উৎসাহ পোষণ করতেন। তিনি এক ধরনের পাম্প তৈরী করেন। অতি প্রয়োজনীয় পানি উত্তোলনের জন্যে জলপ্রবাহের সাহায্যে এই পাম্প চালু হতো। পাম্পের একটা বিরাট চাকা স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হতো। স্রোতের টানে চাকাটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকের একটি দাঁতযুক্ত চাকাও ঘুরতে থাকতো এবং পাম্পের চাপদন্ড চালু হয়ে পানি উপরে উঠে আসতে থাকতো। এই পাম্পের গোটা কাঠামোটি ৭০ ফুটেরও বেশি উঁচু। পানির অন্যান্য ধরনের ব্যবহার সম্পর্কেও তিনি গবেষণা করেছেন প্রচুর। মাছের আকৃতি সম্পর্কেও তিনি গবেষণা করেছেন। গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তিনি জাহাজ নির্মাণের জন্যে এক ধরনের বিশেষ নক্শা তৈরী করেন। পানি সেচ ও নৌ-চালনার সুবিধার জন্যে নদীর গতিপথ পরিবর্তন সম্পর্কেও তিনি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

১৪৯০ সালের দিকে লিওনার্দো উড্ডয়নের জন্যে এক ধরনের যন্ত্রের নক্শা তৈরী করেন। তাঁর পরিকল্পিত যন্ত্র সম্পূর্ণ মানুষের শক্তিতেই চালনার ব্যবস্থা ছিলো। অবশ্য এই যন্ত্র কখনো উড্ডয়ন সক্ষম হয়নি। তাঁর পরিকল্পনা ছিলো,—বড়ো বড়ো দুটি পাখার সাহায্যে মানুষ উড়বে এবং পা দুটোর সাহায্যে পাখা আন্দোলিত করবে। তাছাড়া এক ধরনের হেলিকপ্টারের নক্শাও তিনি তৈরী করেন। তাঁর কল্পিত হেলিকপ্টারে একটা

বিরাট পেঁচালো স্ক্রু ছিলো। তাঁর পরিকল্পনা ছিলো স্প্রি-এর সাহায্যে হেলিকপ্টার চালনা করা। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। এর জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেওয়া তখনকার সময়ে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি পাতলা আস্তরণ দিয়ে পিরামিডের আকারে কাঠের প্যারাস্যুট তৈরী করেছিলেন এবং অনেক উঁচু একটা গীর্জা থেকে লাফ দিয়ে এই ঐতিহাসিক প্যারাস্যুট পরীক্ষা করে দেখানো হয়েছিলো। পতনের গতি হ্রাসের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিলো বলে জানা যায়।

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি একজন অসাধারণ উদ্ভিদতত্ত্ববিদরূপেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর চিত্র এবং রচনায় দেখা যায় যে, তিনি 'অনুগ' সূর্যমুখী ও 'প্রতীপ' সূর্যবিপরীতমুখী জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, গাছের কতোকগুলো শিকড় মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, আবার অন্য কতোকগুলোর মাটির উপরে বিস্তার লাভের প্রবণতাও রয়েছে। একেই 'অনুগ' ও 'প্রতীপ' ভৌমগতি বলা হয়। বৃক্ষের বলয় সম্পর্কেও তিনি সমান সচেতন ছিলেন। বলয়ের সঙ্গে যে উদ্ভিদের বয়সের একটা সম্পর্ক রয়েছে, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত পুষ্পসমূহ দেখে তার থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি পুরুষ ও স্ত্রী উদ্ভিদের ভিন্নতা সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন।

অভিজ্ঞ একদল চিকিৎসাবিদের সহযোগিতায় তিনি শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা অধ্যয়ন করেন প্রচুর। তাঁর অঙ্কিত চিত্রসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের শারীরিক গঠন প্রকৃতি ও কাঠামো সম্পর্কেও তিনি ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'মাথার খুলী' মাধ্যম চিত্রেই সর্বপ্রথম কপাল ও চোয়ালের যে ফাটল আছে তা দেখানো হয়।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসকরা এ দুটোকে 'ললাটস্থি' এবং 'ম্যাক্সিলারী সাইনাস' বলে অভিহিত করেন। ভিঞ্চি সর্বপ্রথম কন্টকের (Spine) দুটির বক্রতা সম্বন্ধে দিক নির্দেশ করেন। সর্বপ্রথম মাতৃগর্ভে শিশুর সঠিক অবস্থানেরও চিত্র অঙ্কন করে দেখিয়ে দেন ভিঞ্চি। তাঁর হৃৎপিন্ড সংক্রান্ত বর্ণনা এবং চিত্রও অত্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। হৃৎপিন্ডের 'প্রকোষ্ঠ দুয়ার' এবং সামগ্রিক কাঠামো সঠিকভাবেই অঙ্কন করেছেন তিনি।

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি'র অনেক চিত্রকেই প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক মডেলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় সময় এসব যন্ত্রপাতির প্রদর্শনীও হয়েছে। "ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন কর্পোরেশন" লিওনার্দো'র যন্ত্রপাতির একটা উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মালিক। এই কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ টমাস জে, ওয়াটসন লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "...আবিষ্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প। বৃহত্তর অর্থে সকল শিল্পই এর আওতায় পড়ে। চিত্রাঙ্কন, পর্যালোচনা, বৈজ্ঞানিক অন্বেষা এবং আবিষ্কার প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি'র যে পরিচয় ফুটে উঠেছে, তাতে আমরা এমন একজন মহান মানুষের পরিচয় লাভ করি, যে বিজ্ঞানী বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে চিন্তা, অনুভূতি এবং সৃজনে আমরণ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন নিরলসভাবে!—"



অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

জন্ম ঃ ১৪ই মার্চ ১৮৭৯
মৃত্যু ঃ ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৫



বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন লিখেছিলেন,—

"মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহোদয়,—

ই. ফারমী এবং এস. জিলার্ড-এর সাম্প্রতিক গবেষণার কিছু অংশ পাণ্ডুলিপির আকারে আমার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ থেকে আমি এই একটি বিশ্বাসে পৌঁছেছি যে, অদূর ভবিষ্যতে ইউরেনিয়াম পদার্থটিকে শক্তির একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের একটি মাত্র বোমা কোনো বন্দরে বিস্ফোরিত করা হলে তা সমগ্র বন্দর এবং সাথে সাথে এর আশেপাশের এলাকা সমানে ধ্বংস করে দিতে পারে।"

ইংরেজী ১৯৩৯ সালের শীতকালের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে লেখা হয়েছিলো এই পত্রটি। এর আরো ছয় বছর পরে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে 'এই ধরনের একটি মাত্র বোমা' ফেলা হয়েছিলো জাপানের 'হিরেশিমা' শহরে। এতে ষাট হাজার লোক নিহত হয়, এক লক্ষ লোক আহত হয় এবং দু'লক্ষ লোক গৃহহীন হয়। পারমাণবিক বোমা শহরের ছয়শত ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে দেয়। কয়েকদিন পরে 'নাগাশাকি' শহরের উপরে ঐরূপ আরো একটি বোমা ফেলা হয়। জাপান সরকার বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন; দুটি বোমা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়।

আইনস্টাইনের ১৯০৫ সালে এক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করা হয়। সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই 'পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং

শক্তিকে পদার্থে পরিবর্তিত করা যায়। পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসারে দেখা যায়, পদার্থকে সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনোটাই করা সম্ভব ছিলো না। আইনস্টাইনের গবেষণা তাঁকে বীজগণিতের নিম্নলিখিত সহজ-সরল সমীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়—সমীকরণটি নিম্নরূপ।

$$E=mc^2$$

এর অর্থ হলো, শক্তি=ভর × আলোকের গতি × আলোকের গতি। আলোকের গতি প্রচুর—প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬০০০ মাইল কিংবা প্রতি মিনিটে ৬০,০০০,০০০,০০০ ফুট। কাজেই সামান্য পরিমাণ পদার্থ থেকে যে শক্তি লাভ করা যায় তার পরিমাণও বিপুল। প্রকৃতপক্ষে এক পাউন্ড কয়লার মতো পদার্থ যদি সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তার ফলে এক হাজার কোটি কিলোওয়াট ঘন্টার বেশি শক্তি পাওয়া যাবে। এ ভাবে দেখা যায় দশ পাউন্ড পদার্থ সারা বিশ্বকে পুরো একমাস বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চালিয়ে নিতে পারে।]

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে জার্মানীর আল্‌ম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের এক বছর পরে পরেই তাঁর পুরো পরিবার সেখানকার বাস উঠিয়ে মিউনিখের শহরতলীতে নতুন বসত করেন। অ্যালবার্টের পিতা একটি ছোট ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল কারখানার মালিক ও পরিচালক ছিলেন। অ্যালবার্টের অবিবাহিত পিতৃব্য ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তিনি এই কাজে সর্বদা সাহায্য করতেন এবং আইনস্টাইন পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। আইনস্টাইনের মাতা সঙ্গীতের দারুণ ভক্ত ছিলেন এবং তিনি বিশেষ করে বিটোফেন পছন্দ করতেন।

সঙ্গীতের প্রতি তাঁর এই অনুরাগের ফলে তাঁর ছয় বছর বয়স্ক পুত্র আইনস্টাইনের জন্যেও বেহালা বাজানো শেখানোর পাঠ শুরু হয়। প্রথম প্রথম তিনি এই বাদ্যটাকে ভালোবাসতেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি এতে মনোযোগী হন এবং দক্ষতা অর্জন করেন আর বিশেষ করে মোজার্টের রাগপ্রধান সঙ্গীতের ভীষণ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। শৈশবের এই সঙ্গীত শিক্ষা তিনি সারা জীবন কাজে লাগিয়েছেন। এবং জানা যায় এ থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা বিশ্রাম ও আনন্দ উপভোগ করেছেন।

অসাধারণ প্রতিভাবান ছেলে বলতে যা বোঝায় আইনস্টাইন তার ধারে কাছেও ছিলেন না। তখন তিনি নিরেট বোকাই ছিলেন। ছেলেবেলায় তাঁর কথা ফুটতে এতো দেরী হয়েছিলো যে, পিতামাতার ভয় হয়েছিলো ছেলেটা হয়তো হাবাই হবে। ছেলেবেলা হতেই তিনি সমবয়সী ছেলেদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতেন এবং আলসেমি করে ও দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটাতেন। তিনি বিশেষ করে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এড়িয়ে চলতেন, পরিশ্রমসাপেক্ষ খেলা থেকে বিরত থাকতেন এবং সৈনিক চাকুরিকে বিশেষ করে ঘৃণা করতেন। মিউনিখের রাস্তায় প্রায়শঃই জার্মান সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের দৃশ্য দেখা যেতো। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের জন্যই সে দৃশ্য ছিলো রোমাঞ্চকর। কিন্তু অ্যালবার্ট কুচকাওয়াজ দেখে অস্বস্তি বোধ করতেন। যন্ত্রের মতো

মানুষের চলাফেরাকে তিনি ঘৃণা করতেন—সব যেনো তাঁর কাছে কলের পুতুল বলে মনে হতো।

মিউনিখে কোনো সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হতো। আইনস্টাইনের পিতামাতা ছিলেন ইহুদী। কিন্তু ধর্মের প্রতি কোনো আগ্রহ তাঁদের ছিলো না। পুত্র অ্যালবার্টকে তাঁরা নিকটতম একটি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এটা ছিলো একটা রোমান ক্যাথলিক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। দশ বছর বয়সে 'জিমন্যাসিয়াম' নামে পরিচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করা হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উপযুক্ত করে দেওয়া হতো। স্কুলে তিনি সুখী ছিলেন না। কোনো রকম সাফল্যও তিনি লাভ করেননি। ছাত্রদেরকে কেবল তোতা পাখির মতো পাঠ মুখস্থ করানো হতো। এটা তাঁর পছন্দ হতো না। যে ধরনের ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে গভীর ধারণা জন্মে, বিদ্যালয়ে তাঁর কোনো ব্যবস্থা ছিলো না।

জিমন্যাসিয়ামে থাকতে আইনস্টাইন ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। ক্যাথলিক মতবাদ সম্পর্কে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ফলে ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁর মনে একটি স্থায়ী শ্রদ্ধার আসনও গড়ে ওঠে। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাত্রই কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং মানুষকে স্বাধীন চিন্তা থেকে বিরত রাখাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। জিমন্যাসিয়াম থেকে উত্তীর্ণ হবার পর তিনি তাঁর ধর্মীয় সংঘের সদস্য পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু হিটলার-নাৎসী শাসন আমলে জার্মানরা যখন ব্যাপকভাবে ইহুদীদেরকে অভিযুক্ত ও হত্যা করতে থাকে তখন তিনি পুনরায় ইহুদী সমাজে ফিরে আসেন। আইনস্টাইনের পিতৃব্য অর্থাৎ সেই ইঞ্জিনিয়ার গণিতশাস্ত্রের প্রতি আইনস্টাইনের আগ্রহ বাড়িয়ে দেন। অঙ্কের কোনো সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যে পরিমাণ পরিশ্রমের দরকার বীজগণিতের সাহায্য নিয়ে কিভাবে তা কমিয়ে করা যেতে পারে বালক অ্যালবার্টকে তাই তিনি শিখিয়ে দেন। বালকের সরল মনের প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বললেন,—"এ একটা মজার বিজ্ঞান। ধর একটা পশু আমরা শিকার করতে চাই, কিন্তু কিছুতেই তাকে আমরা ধরতে পারছি না। এই পশুটার নাম আপাততঃ আমরা 'ক' দিলাম। এখন যতোক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমরা ধরতে পারবো না ততোক্ষণ একে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবো।" জ্যামিতির পাঠ কিশোর আইনস্টাইনের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং রোমাঞ্চিত করে তোলে। এর সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট ভাষা, উপপাদ্যের প্রমাণ, প্রমাণের যুক্তি এবং সম্পাদ্যের সমাধানকে যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণের সুযোগ তাঁর মনে আনন্দের শিহরণ নিয়ে আসে। আইনস্টাইন বলেছেন,—"তাঁর শৈশবের দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি হচ্ছে,—পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে একটি চুম্বক দিকনির্ণয় যন্ত্র উপহার এবং অপরটি হচ্ছে বারো বছর বয়সে তাঁর ইউক্লিডের জ্যামিতি অধ্যায়ন।", তিনি আরো বলেছেন,—"শৈশবে এই বই যে ছেলের মনে আনন্দের দোলা দেয় না, তাত্ত্বিক অনুসন্ধানী হওয়া সে ছেলের কাজ নয়।"

আইনস্টাইনের বয়স যখন পনেরো বছর তখন তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থার জন্যে মিউনিখের বৈদ্যুতিক ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্যে তিনি ইতালীর মিলানে গমন করেন। অ্যালবার্ট তখনো জিমন্যাসিয়ামে পড়ছিলেন। কাজেই ডিপ্লোমা নেওয়ার জন্যে তাঁর মিউনিখেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আইনস্টাইনের কাছে বিদ্যালয় ক্রমেই বিরক্তিকর হয়ে উঠছিলো। তিনি গণিতশাস্ত্রে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য যেসব বিষয়ে কঠোর নিয়ম রক্ষা করে শিক্ষাদান করা হয়েছিলো তাতে তিনি অত্যন্ত খারাপ করছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে শিক্ষকদের প্রতি অন্ধভক্তি দেখিয়ে চলতে হতো। কিন্তু আইনস্টাইন তা না করায় তাঁকে জিমন্যাসিয়াম থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি বাধ্য হয়ে ইতালীতে পিতার নিকটে ফিরে যান।

ইতালীতে কিছুকাল কাটানোর পর তিনি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পেলেন। তিনি গণিত সংশ্লিষ্ট পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং তদনুসারে তিনি সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অবস্থিত বিখ্যাত 'সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক্ স্কুলে' ভর্তির পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু তিনি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিলো অসাধারণ। কিন্তু ভাষা-সাহিত্য এবং জীববিজ্ঞানে তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। পলিটেকনিকের ডিরেক্টর অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর দখল দেখে বিস্মিত হলেন এবং সুইজারল্যান্ডে তাঁর ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে বিদ্যালয়গুলোকে মিউনিখের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে পরিচালিত হতে দেখে আইনস্টাইন অত্যন্ত খুশি হলেন। এখানে কঠোর নিয়ম পালনের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলো না। ছাত্ররা নিজেদের মতো দেখেশুনে চলবে বলে আশা করা হতো। শিক্ষকরাও ছাত্রদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন। জীবনে সর্বপ্রথম আইনস্টাইন বিদ্যালয়কে উপভোগ্য স্থান বলে মনে করলেন। পাঠ্যক্রম সমাপ্তির পর তাঁকে জুরিখের 'সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুলে' ভর্তি করা হলো।

জুরিখে অবস্থানকালে তিনি পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। আর্থিক দিক থেকে জুরিখে তাঁর অবস্থা সচ্ছল ছিলো না। ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ার দরুণ তাঁর পিতাও তাঁকে তখন সাহায্য করতে পারিননি। সৌভাগ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে জনৈক অবস্থাপন্ন আত্মীয় তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হন।

আইনস্টাইন বিশেষ প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যাপকদের নিকট থেকেও তিনি বহু প্রসংশা ও সুপারিশ পত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষকতার চাকুরিলাভে তিনি সক্ষম হলেন না। জীবিকার তাগিতে তিনি বার্নে অবস্থিত 'সুইসপেটেন্ট' অফিসে পরীক্ষকের চাকুরি গ্রহণ করেন।

১৯০৫ সালে পেটেন্ট অফিসে চাকুরিরত থাকাকালেই আইনস্টাইন বিশেষ 'আপেক্ষিকতত্ত্ব' আবিষ্কার করেন। যা পরিণামে আজকের পারমাণবিক বোমায় সম্পূর্ণরূপ

লাভ করে। সে সময় পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার ভিত্তি ছিলো নিউটনের গতিতত্ত্ব। প্রায় দুশো বছর পূর্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় এবং পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যাবলীর অধিকাংশের জবাব পাওয়া যেতো এই তত্ত্বের মাধ্যমে।—কিন্তু এতে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। উদাহরণ দেয়া যায়। চলন্ত বিমান থেকে যদি সম্মুখের দিকে রকেট নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সে রকেটের গতি হবে তার নিজস্ব গতি ও বিমানের সমান। আলোক সম্পর্কে নিউটনের তত্ত্ব প্রয়োগ করা হলে দেখা যাবে, আলোর উৎস যদি পর্যবেক্ষকের দিকে ধাবিত হয় তাহলে আলোর গতি বেশি হবে। আবার উৎস যদি পেছনের দিকে পিছিয়ে যায় তাহলে তার গতি কমে যাবে। যাহোক, আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এবং মার্কিন নেভাল একাডেমীর অন্যতম শিক্ষক এ. এ. মাইকেলসনের কয়েকটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, আলোর গতি নিউটনের উদ্ভাবিত পূর্ব নিয়ম মেনে চলে না।

মাইকেলসনের এই তত্ত্বের ভিত্তিতে চিন্তা করে আইনস্টাইন যে তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তা অনেকটা নিম্নরূপ—

উৎসের গতি যাই হোক না কোনো, যে কোনো বেগে ধাবমান পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে একই গতিতে আলোর বিকিরণ ঘটতে থাকে। এই তত্ত্বতে বলা হয়,—'আলোর গতির অপরিবর্তনীয়তার নীতি'।

এই তত্ত্বকে খুব বেশি অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু আইনস্টাইনের প্রতিভার পরিচয় এখানেই যে, এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে তিনি যে সূত্রগুলো গড়ে তুলেছিলেন সেগুলো সত্যি হলেও অত্যাশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্য। এগুলোর একটি হচ্ছে এই যে, ভ্রাম্যমাণ ঘড়ি স্থিতিশীল ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে। ঘড়ির যন্ত্রপাতির সঙ্গে এই গতির কোনো মিল বা সম্পর্ক নেই। এই তত্ত্ব পরীক্ষায় সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। পারমাণবিক মহাশূন্যযানযোগে আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের সমস্যার সমাধান হলে কেউ যদি সেই মহাশূন্যযানের ঘড়ির সময়ের হিসাবে এক মাসের কোনো সফর থেকে ফিরে আসেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন তাঁর বাড়িতে রেখে যাওয়া শিশু পুত্রটির বয়স তাঁর পিতার চেয়ে বিশ বছর বেশি হয়ে গেছে।

আলোর গতির অপরিবর্তনীয়তার এই সূত্র থেকেই আইনস্টাইন পদার্থের শক্তিতে রূপান্তর সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। পারমাণবিক বোমা প্রসঙ্গে পূর্বেই এই বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এ তত্ত্বেই সর্বপ্রথম সূর্যের শক্তি-উৎস ব্যাখ্যা করা হয়। সূর্য যদি তার জ্বালানি পুড়িয়েই জ্বলতে থাকতো—তাহলে অনেক আগেই তা ঠান্ডা হয়ে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আসলে তা নয়। আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত $E=Mc^2$ সূত্রে যেমন দেখিয়েছেন, সূর্য তেমনি পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এভাবেই সে বহুকাল ধরে আলোক বিকিরণ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও কোটি কোটি বছর ধরে তা করতে থাকবে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস অ্যালবার্ট-এর হিসেবের প্রতি।

আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলো প্রকাশিত হওয়ায় এবং বিশ্বের গবেষণাগার-, পর্যবেক্ষণাগারগুলো থেকে তাঁর সমর্থনে প্রমানপত্র আসতে থাকার কিছুদিন পরেই আইনস্টাইনের প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯০৯ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন 'প্রফেসর এক্সট্রা অর্ডিনারী'। সেখান থেকে তিনি প্রাগ এর 'জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে' গমন করেন। সেখান থেকে জুরিখে ফিরে পুনরায় তিনি বার্লিনের 'কাইজার ইউলহেলম ইনস্টিটিউট'-এ যোগদান করেন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে নাৎসীরা যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন সৌভাগ্যক্রমে তিনি ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা-সফরে ছিলেন। হিটলারের নাৎসী বর্বরগণ তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী কেড়ে নেয় এবং জার্মান প্রজাতন্ত্র তাঁকে যে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করেছিলো তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়।

নিউজার্সীর অন্তর্গত প্রিন্সটনে অবস্থিত 'ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স্ড স্টাডি' এর 'স্কুল অব ম্যাথামেটিক্স'-এর ডিরেক্টর হয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। তিনি ইসরাইল রাষ্ট্রের একজন উৎসাহী সমর্থক এবং বিশ্ব-সরকারের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁকে যখন ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হতে আহবান করা হয় তখন তিনি অসম্মতি জানিয়ে বলেন,—"বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলীর সাথে আমি সুপরিচিত। কিন্তু মানুষ নিয়ে কাজ করার স্বাভাবিক সামর্থ্য বা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা কোনোটাই আমার নেই—আমি দুঃখিত।"

ফোন্টম এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার জন্য অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর চব্বিশ পৃষ্ঠাপূর্ণ গাণিতিক সমাধানের ভেতর দিয়ে তিনি মাধ্যাকর্ষণ এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকত্বের নিয়মের মিলন ঘটান।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, জাপান সরকারের প্রতিনিধিগণকে-এর ধ্বংস ক্ষমতা প্রদর্শন করা হবে, নিরীহ জাপানীদের উপর এই মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হয়নি। পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা হবে বলেই তিনি আশা করেছিলেন—কিন্তু তাঁর সমস্ত কল্যাণকর ইচ্ছেকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, হলো তার উল্টোটা।

১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকে তিনি অঙ্কের সহজ সমাধানের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁর শেষ বাণী, —"ঈশ্বর কখনো পাশা খেলেন না।"



আলেকসান্দ্রো ভল্টা

জন্ম ঃ ইতালী ১৭৪৫
মৃত্যু ঃ ইতালী ১৮২৭



—"আপনি কি কখনো বিদ্যুতের 'স্বাদ ' নিজ চোখে দেখেছেন'? আমি কিন্তু দেখেছি,— আমি আমার জিহ্বার অগ্রভাগে একটুকরো টিন দ্বারা ঢেকে রাখি। এরপর একটা রূপোর চামচের মোটা কিনারা দিয়ে জিহ্বার আরো ভিতরে স্পর্শ করি এবং টিনের উপর চামচের হাতল স্থাপন করি।" প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আলেকসান্দ্রো ভল্টা এভাবে তাঁর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় বিবৃত করেন। তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর জিহ্বা কম্পিত হয়ে হেঁচকা একটা টান পড়বে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর পরিবর্তে তিনি একটা টক-টক স্বাদ পেলেন।

ইতালীর কোমোতে ১৭৪৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভল্টা জন্মগ্রহণ করেন। ইতালীর আল্পসের পাদদেশে প্রখ্যাত ও রূপময়ী কোমো হ্রদের তীরে কোমো একটি বড়ো শহর। কোমো হ্রদটি বিত্তশালীদের এখনো বসতিস্থাপনে আকৃষ্ট করছে। এই হ্রদ বরাবরই পর্যটকদের জনপ্রিয় স্থান বলে পরিচিত।

আলেকসান্দ্রো ভল্টার পরিবার অবশ্য বিত্তবান সমাজের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে গির্জার ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাবশালী কিছু আত্মীয়ের মধ্যস্থতায় এই প্রতিভাবান বালক ভল্টা একদিন শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স সমাপ্ত করার পর তিনি কোমোর হাইস্কুলে শিক্ষকের চাকুরী লাভ করেন। ১৭৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে শিক্ষকতা করেন। এই সময় তাঁর বয়স

ছিলো ৩৪ বছর। এরপর তিনি 'প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের' নিয়োগপত্র লাভ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্যে তাঁকে পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে তিনি স্বাধীনভাবে গবেষণারও সুযোগ লাভ করেন।

কোমোতে শিক্ষকতাকালেই তিনি 'তড়িৎফোরাস' আবিষ্কার করেন। ইংল্যান্ডের যোসেফ প্রিস্টলির নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি তাঁর আবিষ্কারের বিষয় বর্ণনা করেন। তড়িৎফোরাসের বাস্তাব কোনো মূল্য নেই। কিন্তু স্থির তড়িৎ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্যে বর্তমান কালের বিজ্ঞানের ক্লাসে এর ব্যবহারিক প্রয়োজন রয়েছে।

তড়িৎফোরাসের উপর ভিত্তি করে ভল্টা অনেকগুলো সূত্র আবিষ্কার করেন। যে গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক উপাদানটা বর্তমানে "ক্যাপাসিটর" বা "কন্‌ডেনসার" (জর্মানী) নামে পরিচতি, এই সূত্রগুলো তারই কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানী ভল্টা এর নাম দেন 'কনডেনসেটর'। কিন্তু লন্ডনের 'রয়্যাল সোসাইটি'-এর অনুবাদকগণ নামটা একটু সংক্ষেপ করে 'কনডেনসার' করেন। বৈদ্যুতিক চার্জের প্রতিক্রিয়াকে বড়ো করে দেখানোর জন্যে তিনি নিজে এক ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তদানীন্তন সময়ে বিদ্যুতের পরিমাপ গ্রহণের জন্যে তড়িৎবীক্ষণ ও তড়িৎমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। কিন্তু অতি সংবেদনশীল যন্ত্র এসব তিনি কখনো ব্যবহার করেননি। তিনি একটা তড়িৎফোরাসে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে পাতগুলো পৃথক করে নেন। এর ফলে পাতসমূহের মধ্যে ভোল্টেজ বৃদ্ধির প্রভাব তৈরী হয়। তিনি তাঁর যন্ত্রের নাম দেন 'ক্ষুদ্র তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র' (মাইক্রোইলেক্‌ট্রোস্কোপ্)।

১৭৯১ সালে 'বলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়'-এর প্রাণীবিজ্ঞান ও শারীরবৃত্তে অধ্যাপক লুইগি গ্যালভ্যানি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগারের ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি পিতলের একটি সূক্ষ্মাগ্র শলাকা ব্যাঙের মেরুদন্ডের মজ্জা দিয়ে ঢুকিয়ে দেন। একজন সহযোগী একটা লোহার ছুরি দিয়ে ব্যাঙের পায়ের মাংসপেশী স্পর্শ করেন। লোহার ছুরির অগ্রভাগ পিতলের শলাকা স্পর্শ করা মাত্রই ব্যাঙের মাংসপেশী ভীষণ ভাবে কম্পিত হতে থাকে! গ্যালভ্যানি এভাবে বারবার পরীক্ষা চালান; কিন্তু প্রতিবারে একই প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো—ব্যাঙের মাংসপেশীর ভীষণভাবে কম্পন।

গ্যালভ্যানি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, প্রাণীর মধ্যে সৃষ্ট বৈদ্যুতিকপ্রবাহের ফলে এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ভল্টা তাঁর গবেষণার বিবরণ পাঠ করেন, কিন্তু এতে তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি নিজেই ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষার ফলাফল দেখে তিনি বলেন,—"বস্তুতঃ অলৌকিক কর্মটা আমি নিজেই সম্পন্ন করলাম এবং অবিশ্বাসী থেকে উৎসাহী বিশ্বাসীতে পরিণত হলাম।"

এটা 'প্রাণী-তড়িৎ' এই তত্ত্বে কিন্তু ভল্টা বিশ্বাস স্থাপন করেননি। তাই তিনি গবেষণা অব্যাহত রাখেন। ১৮০০ সালের ২০শে মার্চ তারিখে তিনি লন্ডনের 'রয়্যাল সোসাইটির' নিকট একটা বিখ্যাত পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি 'ভল্টায়িক স্তুপের' পাইল বর্ণনা প্রদান

করেন। আপনি নিজেও এটার একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বিজ্ঞানী ভল্টা—সিলভার, জিঙ্ক ও কার্ডবোর্ডের কতোগুলো শুষ্ক পরিষ্কার পাত্র নেন। তিনি এগুলোকে স্তুপীকৃত করে পর্যায়ক্রমিক এভাবে সাজান,—রৌপ্য, কার্ডবোর্ড, জিঙ্ক, রৌপ্য, কার্ডবোর্ড, জিঙ্ক ব্লক ইত্যাদি।

স্তুপের শেষ মাথা থেকে ক্রমাগত বিদ্যুৎপ্রবাহের ব্যবস্থা ছিলো। বিজ্ঞানী ভল্টা সর্বপ্রথম 'তড়িৎকোষ' বা সেল তৈরী করেন। এই সেলই বর্তমান স্থানান্তর এবং বহনযোগ্য বেতারযন্ত্রের ড্রাইলেস 'ব্যাটারির' অগ্রদূত। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্যুতের ক্রমাগত প্রবাহের উৎস সৃষ্টি করেন। যখন তিনি রূপোর চামচ ও টিন মুখে দেন, তখনো তরিৎকোষ উৎপন্ন হয়েছিলো। এক্ষেত্রে তিনি দুটো ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের ধাতবপদার্থ ব্যবহার করেছিলেন।

তাঁর আবিষ্কার বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক গবেষণায় সম্পূর্ণ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। স্বল্পকালের মধ্যেই 'ভল্টায়িক স্তুপে'র ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা পানিকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভাজন করতে সক্ষম হন। ড্যাভি সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আবিষ্কার করেন। এরই ফলে বিদ্যুৎ ও চুম্বক ধর্মের গবেষণা কর্ম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর ভল্টা প্রচুর সম্মান পেয়ে থাকেন।

সম্রাট নেপোলিয়ান তাঁকে 'প্যারিস ইন্সটিটিউট'-এ ভাষণ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সম্মানে একটা স্বর্ণপদক চালু করা হয়। বার্ধক্যের দরুণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ কতে চান; কিন্তু তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরোও কিছুদিন থেকে যেতে রাজী করানো হয়। বছরে তাঁকে মাত্র একটি ভাষণ দিতে অনুরোধ করা হয় এবং এজন্য তাঁকে পুরো বছরের পূর্ণ বেতন প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়।

লোম্বার্ডি থেকে তিনি সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। অস্টিয়ার সম্রাট তাঁকে পদুয়ার 'ফিলোসফিক ফ্যাকাল্টি'র ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন। ১৮১৯ সালে ৭৪ বছর বয়সে ভল্টা কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তাঁর নিজের শহর কোমোতে অবসর জীবনযাপনের জন্যে ফিরে যান। ১৮২৭ সালের এপ্রিল মাসের ঝলমলে এক সকালে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর কৃতিত্বের স্মরণে কোমোতে একটা আকর্ষণীয় আবক্ষ মূর্তি তৈরী করা হয়। অবশ্য তাঁর স্মরণে অধিকতর বিশ্বজনীন সম্মান হলো তাঁর নামটি, বিদ্যুতের প্রসঙ্গ এলেই তাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। ১৮৯৩ সালে 'ইলেকট্রিশিয়ান্স কংগ্রেসে' বিদ্যুৎ প্রবাহক শক্তিকে 'ভোল্ট' নামে অভিহিত করা হয় তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে। ভল্টার 'পাইল' বা স্তুপই মানুষকে বিদ্যুৎ-যুগের সুবর্ণ দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে।



বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস

জন্ম ঃ সিসিলি খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭
মৃত্যু ঃ সিরাকুজ খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৫



একদা আর্কিমিডিস স্নান করে ফিরে আসেন। ফিরে আসেন শুধু দেহ পরিষ্কার করেই নয়, এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নিয়ে। এই তত্ত্বই আজকের দিনে 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' নামে সুপরিচিত।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭ সালে সিসিলির সিরাকুজ নামক স্থানে আর্কিমিডিসের জন্ম। তিনি ফিডিয়াস নামক জনৈক গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পুত্র। গ্রীক সাম্রাজ্যের তদানীন্তন প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত এক গণিত বিদ্যালয়ে আর্কিমিডিস অধ্যয়ন করেন। তিনি সেমসের 'কেনন'-এর ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানী কেনন ছিলেন তৎকালের একজন খ্যাতিমান গণিতজ্ঞ এবং বিশ্ববিখ্যাত ইউক্লিডের ছাত্র।

দর্শনশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান অধ্যয়নেই আর্কিমিডিস জীবনপাত করেন। তাঁর সমকালীন গ্রীকরা কায়িক পরিশ্রমকে অপমানজনক বলে মনে করতেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারেও তারা ছিলেন বিমুখ। অনেক পন্ডিত ব্যক্তিই মনে করতেন যে, গণিত সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্বে তিনি নিশ্চতরূপেই ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আর্কিমিডিস অবশ্য নিজে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে কিছুই লিখে রেখে যাননি। তিনি শুধু তাঁর উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র, যেনো সেগুলো শুধু মানসিক চিন্তা-ভাবনা থেকেই রূপ নিয়েছে। অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর লব্ধ তথ্যাবলীর বাস্তব প্রয়োগ করেছিলেন।

ইতিহাস আছে যে, স্নানাগারে গোসল করার সময় আর্কিমিডিস আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই তত্ত্ব এখনো 'আর্কিমিডিসের সূত্র' নামে পরিচিত। 'দ্বিতীয় হিয়ারো' একটা নতুন রাজমুকুট তৈরীর নির্দেশ দেন। স্বর্ণকারকে তিনি মুকুট তৈরীর প্রয়োজনীয় স্বর্ণ দিয়ে দিলেন। স্বর্ণকার মুকুট তৈরী করে আনলে দেখা গেলো যে, মুকুটের ওজন স্বর্ণের ওজনের সমান-সমানই হয়েছে। রাজার কিন্তু তবুও সন্দেহ হলোঃ অধিক মুনাফার জন্যে স্বর্ণকার স্বর্ণের সঙ্গে কিছু পরিমাণ রূপো মিশ্রিত করে মুকুট তৈরি করেছে।

বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থের ওজন যে বিভিন্ন রকম—এ কথা সেকালেও জানা ছিলো। সমপরিমান স্বর্ণের ওজন রূপোর ওজনের চেয়ে বেশি। সমস্যাটার সাধারণ সমাধান হলো, মুকুটটিকে গলিয়ে একটা পাত্রে রেখে ওজন করা এবং তারপর সমপরিমাণ গলানো স্বর্ণ উক্ত পাত্রে রেখে ওজন দিয়ে দেখা। যদি প্রথমবারের ওজন পরের বারের চেয়ে কম হয়, তাহলে মনে করতে হবে স্বর্ণকার মুকুটে রূপো মিশ্রিত করে রাজার স্বর্ণ চুরি করেছে। কিন্তু এ ধরনের সহজ সমাধানে রাজার মুকুটটি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই মুকুটটি অক্ষত রেখে স্বর্ণের ওজন বের করা সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। তখন বিষয়টি দু'কুল রক্ষা করে সঠিক সমাধান বের করার জন্যে সম্রাট কর্তৃক আর্কিমিডিসের ডাক পড়লো।

এখান থেকেই স্নানাগারের কাহিনীর শুরু। আর্কিমিডিস নিজেকে বাথটাবে নামানোর পর স্বাভাবিকভাবেই পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর দেহ যতো বেশি পরিমাণে ডুবতে লাগলো, পানির উচ্চতাও ক্রমে-ক্রমে ততোই বাড়তে লাগলো। এ থেকে আর্কিমিডিস উপলব্ধি করলেন যে, রাজমুকুটের ওজন নেওয়ার এটাই উত্তম পন্থা। তিনি একটা পাত্র পানিতে পূর্ণ করে সর্তকতার সঙ্গে মুকুটটি পানিতে ছেড়ে দিলেন। পূর্ণ পাত্রে মুকুট রাখার ফলে যে পরিমাণ পানি উপ্‌চে পড়লো, তা একটা নলের সাহায্যে অপর একটি পাত্রে রেখে দিলেন তিনি। আর্কিমিডিস ধারণা করলেন, যে পরিমাণ পানি বেরিয়ে এলো তার আয়তন অবশ্যই মুকুটের সমান হবে। এর পরের কাজটি সহজ হয়ে এলো—পানির সমান আয়তনের স্বর্ণ নিয়ে মুকুটের সঙ্গে ওজন দিয়ে পরীক্ষা করার পরই ব্যাপারটা ধরা পরে গেলো।

আর্কিমিডিসের এই পরীক্ষার ফলে লোভী স্বর্ণকার অপরাধী প্রমাণিত হলো। রাজা তাকে ফাঁসির হুকুম দিলেন। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব অন্যদিকে—বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা এখনো পর্যন্ত সমান আয়তনের পানির সঙ্গে ধাতব পদার্থের ওজন পরীক্ষা করেন এবং এই পদ্ধতিই 'আপেক্ষিক গুরুত্ব' বা 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

স্বর্ণের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ২০· এর অর্থাৎ এক পাইন্ট স্বর্ণের ওজন ২০ পাউন্ড। অপরদিকে এক পাইন্ট পানির ওজন প্রায় এক পাউন্ডের মতো, আর এক পাইন্ট রূপোর ওজন মাত্র ১০ পাউন্ড।

স্বর্ণের পরিমাপ গ্রহণের সঙ্গে ভাসমান অবস্থার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আর্কিমিডিস লক্ষ্য করেছেন যে, বাথটাবের পানি তাঁকে ভাসিয়ে রাখতে চায় এবং তিনি ইচ্ছে করলেই ভেসে থাকতে পারেন। অপরদিকে তিনি এটাও লক্ষ্য করেছেন যে,—কাঠ প্রভৃতি কতিপয় পদার্থ পানিতে ডোবে না। তাই ডুবে যাওয়া জিনিসকে ভাসিয়ে রাখার একটা প্রবণতা বা প্রভাব পানির মধ্যে রয়েছে কিনা—এটা তিনি আশ্চর্যের সঙ্গে ভেবেছিলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—"তরল পদার্থে ভাসমান বস্তু যে পরিমাণ তরল পদার্থ অপসারিত করে, ঠিক সে পরিমাণ পদার্থের সমান শক্তি তাকে উপরের দিকে ঠেলে রাখে।"

আর্কিমিডিসের এই তত্ত্বটা বিশ্লেষণ করা যাক। ধরা যাক ১৬ পাউন্ড ওজনের এক টুকরো লৌহখন্ড। এই লৌহখন্ডটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা নেবে। একটা পুকুরে লৌহখন্ডটি স্থাপন করলে কিছু পরিমাণ পানি অপসারিত করবে এবং এ ক্ষেত্রে দুই পাউন্ড ওজনের পানি অপসারিত হবে। তাই পানির মধ্যে লৌহখন্ডটির ওজন নিলে ওজন দাঁড়াবে ১৬ পাউন্ডের পরিবর্তে ১৪ পাউন্ড। এজন্যেও লৌহখন্ডের সমান ওজনের পানি অপসারিত হলে তা ভাসতে থাকবে।

আমরা পানিতে ভাসতে পারি, সাঁতার কাটতে পারি। কারন, আমাদের দেহের ওজনে আমরা যে পরিমাণ পানি অপসারিত করি তার ঠিক প্রায় সমান-সমান। পানিতে আমাদের সত্যিকার ওজন বলতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই থাকে না। তাই আমাদের দেহ সম্পূর্ণভাবে পানির উপর থাকলে ভেসে থাকতে তখন আমাদের খুবই সুবিধা; কিন্তু মাথা পানির উপরের দিকে তুলে রাখতে চাইলে ভেসে থাকতে অপেক্ষাকৃত অসুবিধা হয়। কাঠখন্ড বা নৌকোর সম্পূর্ণ অংশ পানির উপরে থাকে না। কাঠ বা নৌকোর সমান ওজনের পানি অপসারণের জন্যে কিছু অংশ অবশ্যই ডুবে থাকতে হয়।

যেমন মালবাহী জাহাজ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ পানির নিচে থাকে। কারণ ঐ জাহাজকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে অধিক পরিমাণ পানির অপসারণ দরকার। এর থেকেই জাহাজের পানি অপসারণের কথাটার সৃষ্টি। আধুনিক একটি যাত্রীবাহী জাহাজ ৮০ হাজার টন পানি অপসারিত করতে পারে। এক কথায় এর ওজন ৮০ হাজার টন। আণবিক সাবমেরিনসহ যাবতীয় ডুবোজাহাজ আর্কিমিডিসের এই সূত্রের উপর নির্ভরশীল।

আর্কিমিডিস পানি উত্তোলনের একটা যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলেন। এই যন্ত্রকে এখনো 'আর্কিমিডীয় স্ক্রু' বলা হয়। এই পেঁচালো স্ক্রু ঘোরানোর সঙ্গে-সঙ্গে পানি উপরের দিকে উঠে আসে। বিদেশে গম ভাঙার জন্যেও এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং স্ক্রু ড্রাইভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গমের গা থেকে আটা ও খোসা পৃথক করে। এই একই নিয়মনীতি অনুসারে গৃহকর্ত্রীরা মাংস পেষক (Meat grinder)-এর সাহায্যে আজকাল হাড্ডি থেকে মাংস আলাদা করেন।

আর্কিমিডিস "ঠেস্‌কল" (Lever) ব্যাবহারে গণিতের প্রভাব দেখিয়েছেন এবং এই পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেছেন। এই সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ নিজ বাহুবল বহুগুণ বৃদ্ধি করে বিপুল পরিমাণ বোঝা স্থানান্তরে সক্ষম হয়েছেন। এই কৌশলের গুরুত্ব কতোটা তা অনুধাবনের জন্যে আর্কিমিডিস ঘোষণা করেছেন, —"আমাকে দাঁড়াবার একটা জাঁয়গা দিন, আমি পৃথিবীটাকেই স্থানান্তর করবো।"

এক প্রান্তের বোঝা উত্তোলনের জন্যে ঠেস্‌কলের অপর প্রান্তে কি পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন, তা 'কি-লকে'র (Pivot) দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,—এক হাজার পাউন্ড পরিমাণ ওজন ১০০ পাউন্ডের সমান শক্তি দ্বারা উত্তোলন সম্ভব, যদি ঠেস্‌কলের যে প্রান্তে বোঝা রাখা হয়েছে সে প্রান্ত থেকে কী-লকের যে দূরত্ব, তার চেয়ে কী-লক থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব দশগুণ পরিমাণ বেশি হয়।

পার্কের খেলনা 'সী-স'-এর কথা মনে করুন। ক্রসবার থেকে দূরবর্তী প্রান্তে বসা একটা ছোটো ছেলে ক্রসবারের নিকটবর্তী প্রান্তে বসা তার চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশি ওজনের ছেলের সঙ্গে ওজনে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।

বিশুদ্ধ গণিতের মতো ফলিত গণিতশাস্ত্রেও আর্কিমিডিসের অবদান কম নয়। বৃত্তকে সমকোণী চতুর্ভুজে পরিণত করার সমস্যা কখনো সমাধান হয়নি। মূলত এই সমস্যাটা হচ্ছে বৃত্তের সঠিক ক্ষেত্রফল নির্ণয়। গণিতজ্ঞরা এ সম্পর্কে খুব কাছাকাছি ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছেন কিন্তু একেবারে সঠিক আয়তন নির্ণয় সম্ভব হয়নি। গণিতবিদরা বলেন যে,—বৃত্তের আয়তনের সমান ফল হচ্ছে πR^2; এক্ষেত্রে πpi) এর আনুমানিক আয়তন হলো ৩·১৪১৬। আধুনিক ক্যালকুলেটর মেশিন দ্বারাও এই সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু আর্কিমিডিস πএর আয়তন নিরূপণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি এর আয়তন নির্দেশ করেছেন ৩·১৪০৮ এবং ৩·১৪২৯-এর মধ্যে। বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। গণনা সম্পর্কে অধ্যয়নকালে এখনো ছাত্ররা আর্কিমিডিসের কুন্ডলী পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে।

বিশেষ করে কুন্ডলী ও নল সম্পর্কিত তথ্যের জন্যে আর্কিমিডিস নিজেই গর্ববোধ করতেন। নলের মধ্যে পেঁচালো পাত্র সঠিকভাবে স্থাপন সম্পর্কে যেমন তিনি সূত্র নির্ণয় করেছেন, তেমনি সমভূমি এবং গোল পদার্থের আয়তন নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। আর্কিমিডিস প্রমাণ করেন যে,—গোলকই সর্বাধিক কার্যকরী ও যথার্থ আকৃতি। বড়ো বলের মতো যেসব গোলাকার পানির ট্যাঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের পাত্রেই অপেক্ষাকৃত অধিক পানি ধরে এবং এ গোলাকার ট্যাঙ্ক নির্মাণ খরচও খুব কম পড়ে।

যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেও তিনি তাঁর প্রতিভা দেখিয়েছিলেন। সভ্যতার ইতিহাসে বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর ঠেস্‌কলের নীতি 'Cattapalt' (প্রাচীনকালে ব্যবহৃত এক ধরনের গুলতি) নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিলো।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে,—খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৫ সালে সিরাকুজের লড়াইয়ে আর্কিমিডিসের 'ক্যাটাপাল্ট' ব্যবহারেই যুদ্ধের মোড় গ্রীকদের সপক্ষে গিয়েছিলো, শত্রুসৈন্যরা প্রচুর আহত হয়ে পড়েছিলো।

ঐতিহাসিক পোলিবাস এ সম্পর্কে বলেন,—"নির্দিষ্ট কাজের জন্যে যথার্থ উপযোগী একজন মানুষ এবং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিই যে এককভাবে একটা গোটা সেনাবাহিনীর কাজ করতে সক্ষম, তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।" আজকের দিনেও এ কথার সত্যতা সমানভাবে প্রযোয্য। মাত্র গুটিকয়েক আণবিক বিজ্ঞানী ভয়াবহ পারমাণবিক মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন।

বহু বছর পরে রোমান সেনাপতি মার্সিলাস সিরাকুজ দখল করেছিলেন। তিনি আর্কিমিডিসের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দেন। তবে যুদ্ধের মধ্যে তিনি জনৈক রোমান সৈন্যের ভুলে নির্মমভাবে নিহত হন। কিন্তু তাহলেও রোমানরা যথাযথ সম্মানের সাথে এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকে সমাহিত করেন এবং তাঁর কবরের উপর তাঁর প্রিয় প্রতীক গোলক এবং নলের ছাপ খোদাই করে দেন।

আর্কিমিডিস এক বিরাট প্রতিভা, একজন মহান ও অসাধারণ বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞ—"একজন মানুষ, আর তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এককভাবেই অপরিসীম।" এর সত্যতা?—হ্যাঁ, আর্কিমিডিসই তার উজ্জল প্রমাণ।



বিজ্ঞানী রবার্ট হুক

জন্ম ঃ ইংল্যান্ড ১৬৩৫
মৃত্যু ঃ ইংল্যান্ড ১৭০৩



আপনি কি 'বর্ণ বিভ্রাট' খেলায় আগ্রহী? তাহলে এই রোমান হরফগুলো কি হতে পারে দেখুন তো?-CELLINOSSTTUV."

ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলবর্তী ওয়াইট দ্বীপে ১৬৩৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরে রবার্ট হুক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় গির্জার সহকারী ধর্মযাজক। পদমর্যাদার তুলনায় তিনি আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিলেন। তবে রবার্টের বয়স যখন মাত্র ১৩ বছর তিনি হঠাৎ মারা যান। এর ফলে বালক হুক লন্ডনে চলে যেতে বাধ্য হন। রবার্ট সেখানে অন্যতম নেতৃস্থানীয় চিত্রকর 'স্যারিলিলি'র অধীনে শিক্ষানবিস পেন্টার নিযুক্ত হন। রবার্টের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও, তিনি ছিলেন রোগা। কাজের অবলম্বন তৈল ও রঙের সংস্পর্শ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। প্রতিশ্রুতি থাকলেও তিনি কাজটা তাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তবে চিত্রশিল্পে তাঁর এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনে তাঁর অনেক কাজে আসে।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁর পিতা তাঁর জন্যে মৃত্যুকালে ১০০ পাউন্ড রেখে গিয়েছিলেন। সেকালের জন্য এই অর্থ যথেষ্ট ছিলো। এর ফলে তিনি 'ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুলে" যোগদানে সমর্থ হন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে হুক 'অক্সফোর্ডে' যোগদান করেন এবং স্কুল থেকে কলেজে উত্তীর্ণ হন। তিনি গির্জার গায়ক দলে গান করেন এবং খানসামার কাজসহ বহু প্রকার ছোটো কাজ করেন। কাজেই বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা ছিলো। তিনি ভালো

চারু-কারু ও অঙ্কন শিল্পী ছিলেন, তিনি কাঠ ও ধাতব প্লেটের উপরেও কাজ করতে পারতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ও কৃতী ছাত্র।

অক্সফোর্ডে রবার্ট হুক ক্রিস্টোফার ওরেন এবং বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েলকে শিক্ষক পদে পান। রবার্ট বয়েল কৃতী এবং বিত্তশালী বিজ্ঞানী। তিনি রবার্ট হুক থেকে ৮ বছরের বড়ো ছিলেন। তিনি তাঁর এই আকর্ষণীয় ছাত্রকে গবেষণা ও গবেষণাগারের সহকারী করে নেন। ওরেন জ্যামিতিতে নিজস্ব গবেষণার জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং ১৬৬০ সালে তিনি অক্সফোর্ডে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬৬৩ সাল থেকে ওরেন স্থপতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। লন্ডনের 'সেন্টপল্স গির্জা'র নক্শা বা স্থপতিকাররূপে আজ অব্দি তিনি খ্যাতিমান। ক্রিস্টোফার ওরেনের গৃহ ছিলো তৎকালীন ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের মিলনকেন্দ্র। এই গৃহ ছিলো 'অদৃশ্য কলেজের' সম্মিলন স্থান। এই অদৃশ্য কলেজটিই পরবর্তীকালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের গুরুত্বপূর্ণ 'রয়্যাল সেসাইটিতে' পরিণত হয়।

অনেকেরই বিশ্বাস যে, গ্যাস সম্পর্কিত সূত্র সহ রবার্ট বয়েলের অবদানের অনেক কিছুই হুকের মেধাশক্তি এবং যান্ত্রিক দক্ষতারই পরিণতি। প্রকৃতপক্ষে হুক নিজেই এই কৃতিত্ব দাবি করেছেন। অবশ্য বয়েল সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন বলেই প্রতিয়মান হয়। তাঁর গবেষণাগারে 'ভ্যাকুয়াম পাম্প' আবিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে হুককে তাঁর কৃতিত্ব প্রদান করেন, যদিও সে সময় পাম্পগুলো 'বয়েল ইঞ্জিন' নামেই পরিচিত ছিলো।

রয়্যাল সোসাইটিতে হুক একটি অবৈতনিক কাজও করতেন। অবশ্য কাজটা খুবই আকর্ষণীয় ছিলো। সোসাইটির প্রতিটি বৈঠকের পূর্বে ফেলো-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী যিনি গবেষণা করতে ইচ্ছুক থাকতেন, তিনি তার বিবরণ তৈরি করতেন। এর ফলে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা সম্পর্কেই তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং এতে তাঁর গবেষণার মান উন্নীত হয়।

অণুজগতের চিত্তাকর্ষক তথ্যাদি বর্ণনা করে হুক রয়্যাল সোসাইটির নিকট পত্র লিখতেন। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তিশালী একক 'পরকলা' দিয়ে হুক কাজ করতেন। তিনি বহু 'পরকলা' তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর একটাও ছাড়তে সম্মত ছিলেন না। এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য রয়্যাল সোসাইটি হুককে দায়িত্ব প্রদান করেন। একটা কার্যকরী 'যৌগিক অণুবীক্ষণ' তৈরি করার জন্যেও তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়। **শিল্পীর নিপুণ** দক্ষতা নিয়ে তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দর্শনের যোগ্য ৬০টি বিভিন্ন ধরনের উল্লেখযোগ্য চিত্র অঙ্কন করেন। এর মধ্যে ছিলো— মৌমাছির চোখ, ডাঁশ পোকার রূপান্তর, পালকের গঠনপ্রকৃতি, উকুন, মাছি ইত্যাদি। সব কিছুকে তিনি অতি যত্নের সঙ্গে নির্ভুলভাবে অনেক বড়ো করে অঙ্কন করেন। ১৬৬৪ সালে তাঁর

'মাইক্রোগ্র্যাফিয়া' গ্রন্থে এই স্মরণীয় চিত্রগুলো প্রকাশিত হয়। কিভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহার করতে হবে তা সেই গ্রন্থে হুক দেখিয়ে দেন। তবে লেভ্যানহুককেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জনকরূপে ধরা হয়।

১৬৬৬ সালে লন্ডনে এক প্রলয়ঙ্করী অগ্নিকান্ড ঘটে। অগ্নি নির্বাপণের পূর্বেই নগরীর শতকরা ৮০ ভাগ ধ্বংস হয়ে যায়। ক্রিস্টোফার ওরেন তার স্থপতির অফিসে হুকের সাহায্য গ্রহন করেন। লন্ডন নগরী পূনর্গঠনের সেই পরিকল্পনাটি ওরেনের বলে পরিচিত, আসলে তা হুক-এরই তৈরি। নগরী বৃহদাকারে পুনর্নির্মাণের সুপারিশ করা হয়,—রাস্তাগুলো পরস্পরে সমকোণে অবস্থিত হবে। পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়, অবশ্য পরিকল্পনার কোনো খুঁতের জন্যে নয়। অগ্নিকান্ডে রক্ষাপ্রাপ্ত ভবনসমূহের মালিকদের বিরোধিতার জন্যেই পরিকল্পনাটি বাতিল হয়। ফলে এখনও লন্ডন নগরীতে বহু সংকীর্ণ আকাঁ-বাঁকা অলি-গলি রয়েছে।

হুক ছিলেন একজন খাঁটি ও নিখুঁত ইঞ্জিনীয়ার। তিনি আলোক সম্পর্কিত নিজস্ব জ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি দূরবীক্ষণ দর্শনযন্ত্র এবং পরিবর্তনযোগ্য স্ক্রুর সাহায্যে একটি 'কোয়াড্রান্ট' তৈরি করেন। নৌচলনাকালে জরিপকার্য পরিচালনার উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বাতাস পরিমাপক গজ, ব্যারোমিটার, বৃষ্টি মাপার গজ এবং আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলো। রয়্যাল সোসাইটির উদ্যোগে তিনি আবহাওয়া সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। তাই হুককে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান যন্ত্রের জনক বলা হয়। আবহাওয়া নির্ধারণে সূর্যের বিকিরণ এবং পৃথিবীর আবর্তনের যা সত্যিকার কর্ম তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন।

নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' প্রকাশের পাঁচ বছর পূর্বে হুক রয়্যাল সোসাইটিতে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণ থেকে বিশ্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি আন্দাজ করা যায়। তিনি বলেন—"নভোমন্ডলের সকল বস্তুরই আকৃতি গোলক ধরনের এবং তাদের অনেকগুলোই নিজ-নিজ অক্ষরেখায় আবর্তিত হয়। তাদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণশক্তির অস্তিত্ব না থাকলে তাদের সকল আলগা অংশই (Extraportion) গুলতির পাথরের মতো ছিটকে বেড়িয়ে যেতো।

নিউটন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ১০ বছর পূর্বেই রচনা করেছিলেন, কিন্তু তখনো পর্যন্ত সেটা প্রকাশ করেননি। তিনি যখন শেষ পর্যন্ত 'প্রিন্সিপিয়া' রচনা করেন, তখন হুক ভেঙে পড়েন। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে, নিউটন তাঁর কিছুসংখ্যক

গবেষণাকর্মকে স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই ব্যবহার করেছেন। এই ঘটনা উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি করে এবং এই বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে ঝগড়া বিবাদেরও সৃষ্টি হয়।

কাহিনীর শুরুতে যে 'বর্ণ-বিভ্রাট' দেওয়া হয়েছে, তা কি সমাধান করতে পেরেছেন কেউ? সঠিক সমাধান হবে—"উট্ টেনসিও, সিক ভিস" [Ut Tensio, Sic Vis]। এটা হচ্ছে হুকের স্থিতিস্থাপক সূত্রের ল্যাটিন রূপ। ১৬৭৬ সালে হুক এই বর্ণ-বিভ্রাটকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেন। এইভাবে তিনি প্রমাণ করেন যে, তিনিই এই চিন্তাধারাটা বিকাশে অগ্রজ, যদিও সকল তথ্য সম্পর্কে তিনি নিজেও সন্দেহমুক্ত ছিলেন না। ল্যাটিন বাক্যটির অনুবাদ হলো ঃ "ব্যাপ্তি ও শক্তির আনুপাতিক"। হুকের সূত্রকে অবিশ্বাস্য রকমের সহজ প্রতীয়নমান হয়। যদি এক পাউন্ড ওজন একটা স্প্রিংয়ে এক ইঞ্চি প্রসারণ ঘটে, তাহলে দুই পাউন্ড ওজনে দুই ইঞ্চি প্রসারণ ঘটবে এবং ১০ পাউন্ডে ১০ ইঞ্চি প্রসারণ হবে। স্প্রিং-এর শক্তির সীমার মধ্রে থেকেই এভাবে আনুপাতিক প্রসারণ বা বৃদ্ধি চলবে।

হুক এই নীতি স্প্রিং ভারসাম্য উদ্ভাবনে তক্ষুণি প্রয়োগ করেন। হুক স্প্রিং স্থিতিস্থাপক এবং একটা পরিচিত পিন্ডকে 'সেন্ট পলে'র গির্জার উপরে নিয়ে যান এবং প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, যতো উপরে যাওয়া যায় মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ ততোই হ্রাস পায়। এই পরীক্ষার মূলে এই তত্ত্বই কাজ করেছিলো যে,—পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটে মাধ্যাকর্ষণের টান অধিক এবং কেন্দ্র থেকে যতোই দূরে যাওয়া যাবে আকর্ষণ ততোই হ্রাস পাবে।

স্প্রিং সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণের ফলেই ঘড়ি আবিষ্কার সম্ভব হয়। তখন দোলকঘড়ির সাধারণ ব্যবহার প্রচলিত ছিলো। কিন্তু এই ঘড়িকে এক জায়গায় স্থির রাখতে হতো। চলন্ত জাহাজে দোলকঘড়ির ব্যবহার কার্যকর ছিলো না। তদুপরি নিরক্ষরেখার দিকে এগিয়ে গেলেও দোলকঘড়ির সময় ঠিক থাকতো না। নিরক্ষরেখার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হ্রাসের ফলেই এটা হতো। হুক দোলকের পরিবর্তে 'স্থিতিস্থাপক চাকা' এবং 'হোয়ার স্প্রিং' ব্যবহার করেন। পরিকল্পনাটা হলো এই যে,— হেয়ার স্প্রিং নিজ কেন্দ্রস্থলের এদিক থেকে ওদিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে অব্যাহতভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে। এখানেও হুকের স্বপ্ন পুনরায় বাতিল হয়ে যায়। ফ্রান্সের ক্রিশ্চিয়ান হইগ্যান্‌স্, অনুরূপ পদ্ধতি ১৬৭৫ সালেই উদ্ভাবন করেন এবং তিনি তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট করিয়ে নেন। তবুও হুক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নিজ অগ্রাধিকার প্রমাণে সফল হন; কিন্তু হইগ্যান্‌স্ -এর পেটেন্টই বহাল থাকে। এরপর হুক এই ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে এক্ষেত্রে আর অগ্রসর হননি।

হুক রয়্যাল সোসাইটির সেক্রেটারীর পদেও কাজ করেন। ১৬৮২ সালে তিনি এই কাজ ছেড়ে দিলেও, বৈজ্ঞানিক তথ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ রচনা কর্ম তিনি অব্যাহত রাখেন।

হুক চিরকুমার ছিলেন। তাঁর এক সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁর সঙ্গে থাকতেন এবং ঘরের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। ১৬৮৭ সালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অকাল তিরোধানে হুক একেবারে মুষড়ে পড়েন। ১৭০৩ সালে হুকে'র মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত টিকা ও মন্তব্যসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে প্রায় ৪ লক্ষ শব্দ স্থান পায়। এরপরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ কর্মের পূর্ণ বিবরণ বিশ্বজুড়ে উদ্‌ঘাটিত হয়।

জাগতিক খ্যাতি ও সাফল্য তাঁর মুঠোর মধ্যে আসেনি। কিন্তু মৌলিক মনন থেকে তিনি বহু তত্ত্ব ও আবিষ্কারের ধারণা পোষণ করেছিলেন। যখন তিনি স্ক্রু ড্রাইভারের মাথা তাঁর ঘড়ির উপর রেখে কাঠের হাতল কানের কাছে লাগিয়ে নিজ ঘড়ির শব্দ শ্রবণ করেন, তখন তিনি 'স্ট্রেথোসকোপ'-এর আবিষ্কার সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত দেন। অবশ্য এর ১৫০ বছর পরে তা পুরোপুরি রূপ দেয়া সম্ভব হয়। কর্কের গঠন কাঠামো বর্ণনা করার জন্যে তিনি 'সেল' বা কোষ শব্দটি ব্যবহার করেন। অণুবীক্ষণের মধ্যে তিনি এই কোষের সন্ধান পান এবং একে মৌমাছির চাকের সঙ্গে তুলনা করেন।

তাঁর যুগের অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতো তিনিও সমাজ-কল্যাণে উৎসাহী ছিলেন এবং মানুষের মন-মানসিকতা, আর্থিক অবস্থা উন্নততর করার জন্য গবেষণায় মনোযোগ দেন। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সর্বদা খনি-শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যাবলী সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

বরার্ট হুক ছিলেন এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। তাঁর আবিষ্কারসমূহ নিউটন, হইগ্যান্‌স্ এবং লেভ্যানহুকে'র মতোই মহান। তবে স্প্রিং সম্পর্কিত সূত্রের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন—যা 'উট্ টেনসিও, সিক ভিস' নামে পৃথিবী জুড়ে এই মহান বিজ্ঞানীকে আজো স্মরণীর করে রেখেছে।



স্যার আইজ্যাক নিউটন

জন্ম ঃ ইংল্যান্ড ১৬৪২
মৃত্যু ঃ ইংল্যান্ড ১৭২৭



১৬৪২ সালের বড়োদিনে ইংল্যান্ডের ছোটো গ্রামের একটি খামার বাড়িতে স্যার আইজ্যাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে 'বড়োদিনের ক্ষুদে উপহার' বলেই ধরে নেয়া হয়েছিলো। তাঁর মাতা বলেন,—"জন্মকালে, জ্যাক অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি ছিলো। এই ক্ষুদ্রাকৃতির কারণ, শিশুর জন্ম হয় অকালে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে। জন্মের পূর্বেই তাঁর মাতা বিধবা হয়েছিলেন। শিশু বাঁচবে বলে তখন আশাই করা হয়নি। কিন্তু এই শিশুই একদিন বড়ো হয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

গণিত, মাধ্যাকর্ষণ, যন্ত্রবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিউটনে'র কৃতিত্ব এতো ব্যাপক এবং মৌলিক ছিলো যে, অন্যগুলোকে বাদ দিলেও এর যে কোনো একটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদানের ভিত্তিতে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারতেন—বেঁচে থাকতেন পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে।

নিউটনে'র দুবছর বয়সের সময় তাঁর মা পুনরায় বিয়ে করেন। মায়ের এই বিয়ের পর আইজ্যাককে তাঁর দাদী'র নিকট পাঠানো হয়। শৈশবকালে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। অবশ্য নিজ হাতে বিভিন্ন জিনিস তৈরীতে তাঁর ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'হাওয়াকলে'র একটা মডেল তৈরি করেন। সত্যিই এই কল কাজ করেছিলো। তিনি জলঘড়ি এবং সূর্যঘড়ি তৈরি করেছিলেন (এটা এখনও লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।) তিনি বই পড়তে

এবং চিত্রাদি নকল করতে ভালবাসতেন। ফুল এবং ঔষধি সংগ্রহ করাও তাঁর প্রিয় সখ ছিলো।

১৪ বছর বয়সে আইজ্যাককে তাঁর মা দাদী'র কাছ থেকে ফিরিয়ে আনেন। মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর তখন মৃত্যু হয়েছে। মা তাঁর খামার পরিচালনার সাহায্যের জন্যেই কিশোর আইজ্যাককে ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু কিশোর নিউটন খামারের কাজে একেবারেই অযোগ্য প্রমাণিত হন। নিজের খামারের কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে তিনি বই পড়তেন বা দিবাস্বপ্ন দেখতেন, অথবা বসে-বসে কাঠের মডেল তৈরি করতেন। অবশেষে তাঁর মা তাঁকে কলেজে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৮ বছর বয়সে তরুণ নিউটন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ক্যাম্ব্রিজে গিয়ে তিনি বিখ্যাত 'ট্রিনিটি কলেজে' ভর্তি হন।

নিউটন ক্যাম্ব্রিজে ৪ বছর অধ্যয়ন করেন এবং ১৬৬৫ সালে গ্রাজুয়েশান ডিগ্রি লাভ করেন। ক্যাম্ব্রিজে অবস্থানকালে তিনি অধ্যাপক আইজ্যাক ব্যারোর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন নিউটনে'র গণিতের অধ্যাপক। অধ্যাপক ব্যারো নিউটনে'র ব্যতিক্রমী কর্মকান্ড দেখে বুঝতে সমর্থ হন যে, সাধারণের অনেক বাইরে নিউটনে'র স্থান এবং তিনি নিউটনকে নিজ গাণিতিক প্রতিভা বিকাশে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করেন।

সে সময় ইংল্যান্ডে মহামারী আকারে 'প্লেগ রোগ' ছড়িয়ে যায়। এই মহামারীতে জনসংখ্যার এক-দশমাংশের অকাল মৃত্যু হয়ে যায়। ক্যাম্ব্রিজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, ছাত্ররা নিজ-নিজ গৃহে ফিরে যান। নিউটনও তাঁর জন্মস্থান সেই খামার বাড়িতে তাঁর মায়ের কাছে ফিরে যান। প্রায় দেড় বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় পুরো-পুরি না খোলা পর্যন্ত তিনি সেখানে কাটিয়ে ছিলেন। সেই সময়ই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিউটনে'র জন্যে সবচাইতে মূল্যবান ও ফলশ্রুতিময় সময়।

নিউটন যন্ত্র-বিজ্ঞানের মূল সূত্রসমূহ আবিষ্কার করেন এবং মাধ্যাকর্ষণের মূল সূত্র আবিষ্কর করেন, পার্থক্য নির্ণায়ক ও অবিচ্ছেদ্য উচ্চতর গণনা প্রণালীর প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন এবং আলোক বিজ্ঞানের মহান আবিষ্কারসমূহের ভিত্তিও তিনিই উদ্ভাবন করেন। এই সব আবিষ্কারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োগের মধ্যেই তাঁকে তাঁর বাকি বৈজ্ঞানিক জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তাঁর সমস্ত সৃজনশীল কাজ সেই ১৮ মাসেই সম্পন্ন হয়। সেই সময় তাঁর বয়স ছিলো ২৩ কিংবা ২৪ বছর।

নিউটন তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহের কথা তখনও প্রকাশ করেননি। এই গোপনীয়তার দরুন পরবর্তী সময়ে নিউটনকে কেন্দ্র করে প্রচুর বিতর্ক ও যুক্তি-তর্কের সৃষ্টি হয়েছিলো।

১৬৬৭ সালে ক্যাম্ব্রিজ পুনরায় খোলা হলে, নিউটন সেখানে সহযোগী শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। শিক্ষা-জীবনে তিনি দ্রুত উন্নতি লাভ করেন এবং ২৬ বছর বয়সে তিনি গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে একদিন তিনি তাঁর শিক্ষক ও উৎসাহদাতা

আইজ্যাক ব্যারো'র স্থলাভিষিক্ত হন। এই পদ লাভ বিজ্ঞানী নিউটনকে আরো বেশী উৎসাহিত করে।

আলোর গবেষণায় নিউটন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। সেকালে আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দূর্বলতা ও অস্পষ্টতায় তিনি খুবই বিরক্ত হন। এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় তিনি ত্রিভুজাকৃতি 'ত্রিশিরা' ত্রিকোণ বিশিষ্ট কাঁচ ব্যবহার (Prism) করেন। ত্রিশিরার উপর সূর্যোলোকের আলো প্রতিবিম্বিত করে তিনি তাঁর মূল গবেষণা শুরু করেন। একটা অন্ধকার কক্ষে তিনি কাজ করেন। দরোজার একটা ছিদ্র দিয়ে তিনি অন্ধকার কক্ষে সূর্যালোক ধারণ করেন। তিনি দেখেন যে, রঙধনুর এক ফালির আকারে সাদা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি একে 'বর্ণালী' নামে অভিহিত করেন। ঐ বর্ণগুলো নিম্নলিখিত ধারায় অবস্থান করছিলো ঃ লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, লালাভো ও বেগুনি।

নিউটন এরপর একটি ব্যতীত অন্য বর্ণগুলোর পথ বন্ধ করে দেন। মনে করি শুধু, 'সবুজ' বর্ণেরই পথ বন্ধ করা হলো না। সবুজ রং-এর কিরণকে অন্য একটা ত্রিশিরার মাধ্যমে প্রবাহিত করা হলো। নিউটন লক্ষ্য করলেন যে, সবুজ রঙটা একটু বাঁকা হলো, কিন্তু রঙ পরিবর্তিত হলো না। প্রতিটি রঙ নিয়েই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। এককভাবে কোনো রঙ বা বর্ণই সাদা আলোর মতো অন্য কোনো বর্ণে পরিবর্তিত হলো না। অবশ্য তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দ্বিতীয় ত্রিশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতিটি বর্ণ বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকা হয়েছে। তখন নিউটন একটা সহজ কিন্তু চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, সূর্যের সাদা আলোক আসলে বর্ণালীর সব কয়টি বর্ণের সংমিশ্রণ! ত্রিশিরার কাঁচ প্রতিটি বর্ণকে বিভিন্ন পরিমানে ও পরিমাণে বাঁকা করেছে, অর্থাৎ বর্ণগুলোকে আলাদা করেছে।

এটা থেকেই নিউটন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে,—বর্ণের ছায়াপাত ব্যতিত 'পরকলা' তৈরী করা সম্ভব নয়। পরকলার ব্যবহার বাদ দিয়ে নিউটন 'প্রতিফলিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র' আবিষ্কার করেন। নক্ষত্রের আলোক প্রতিবিম্বিত করার জন্য তিনি এতে বাটির আকার বিশিষ্ট ধাতব আয়না ব্যবহার করেন। এই ধরনের দূরবীনের কাঁচের মধ্য দিয়ে আলো অতিক্রম করতে পারে না। ফলে, আলোক রশ্মি অসমানভাবে বাঁকা হওয়ার বা রঙের ছায়াপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানে এর উল্লেখ কৌতুকজনক হবে যে,— প্রায় আরো শতবর্ষ পরেই রঙের ছায়াপাত পরিহার করে 'পরকলা' তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাঁচের সমন্বয় সাধন করেই এই ধরনের রঙ বর্ণহীন 'পরকলা' তৈরী করা হয়।

নিউটন তাঁর দূরবীনের যান্ত্রিক সমস্ত কাজকর্ম নিজেই সমাধা করেন। আয়নার ব্যাস ছিলো প্রায় এক ইঞ্চি। মাউন্ট প্যালোমারে অবস্থিত 'ক্যালিফোর্নিয়া ইন্স্টিটিউট অব টেক্নোলজী'র মানমন্দিরে ১৭ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট প্রতিফলনযোগ্য আয়না রয়েছে।

• তাঁর প্রথম প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের বিষয়বস্তু ছিলো—'আলোক বিজ্ঞান'। 'আলোক বিজ্ঞান' সম্পর্কিত তাঁর গবেষণায় সমালোচনা এবং সমর্থন দুটোই সৃষ্টি হয়। সমকালীন কৃতী বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হুইগ্যান্‌স, রবার্ট হুক এবং অন্যান্যদের পরাজিত করতে নিউটনকে তাঁর তত্ত্বসমূহ সমর্থন করতে হয়। এই বিতর্ককালে একদা তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি এভাবে বর্ণনা করেন,—"বৈজ্ঞানিক গবেষণার সর্বোত্তম এবং নিরাপদ পদ্ধতি হলো,—প্রথমে অধ্যবসায়ের সঙ্গে বস্তুর গুণাবলী অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সব গুণাবলীর সত্যতা নির্ধারণ। তারপর এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য ধীরে-ধীরে তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া।"

এই সময়ে নিউটনে'র বয়স হয়েছিলো ৪৩ কি ৪৪ বছর। এই বয়সেই তিনি সার্থক গবেষক রূপে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সর্বদা সমালোচকদের জবাব দিতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং নিজ আবিষ্কারের আর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্যে তিনি তখন সংকল্পবদ্ধ হন। অবশ্য তিনি তাঁর তত্ত্বাবলী সম্পর্কে গবেষণাকর্ম অব্যাহত রাখেন। এর মধ্যেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে পার্লামেন্ট সদস্যরূপে কাজ করার নিজ যোগ্যতাবলে সুযোগ করে নেন।

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালে ১৬৮৪তে গ্রহের গতি সম্পর্কিত 'কেপ্‌লারের তত্ত্ব' আলোচনার উদ্দেশ্যে নিউটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই আলোচনা থেকে হ্যালে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন যে, সকল নিয়মের সর্বাধিক মৌলিক সূত্র সম্পর্কে নিউটন সবিস্তারে গবেষণা করেছেন। এই সূত্র হচ্ছে—বিশ্বজনীন মাধ্যাকর্ষণের নীতি। হ্যালে অবশ্য কোনো প্রকারে নিউটনকে তাঁর এই সব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বাবলী প্রকাশে সম্মত করান। হ্যালে খুব বিত্তশালী না হলেও মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করা এবং সম্ভাব্য প্রতিটি অসুবিধা থেকে নিউটনকে রক্ষা করার জন্যে যত্নের সাথে সব কিছু দেখে দিতে সম্মত হন।

এর ফসলই ৩খণ্ডে প্রকাশিত বিখ্যাত 'ফিলোসোপিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা।' সেই সময়ে ল্যাটিনই ছিলো বিজ্ঞানের ভাষা। তাই তিনি তাঁর সমগ্র গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশ করেন। 'ম্যাথেমাটিক্যাল প্রিন্সিপল্‌স অব সায়েন্স' নামে মূল ল্যাটিন গ্রন্থের একটা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে 'প্রিন্সিপিয়া' অগ্রজপদক্ষেপের একটা স্বাক্ষর। 'প্রিন্সিপিয়া' বলে দেয় এবং নির্দেশ করে যে,—পৃথিবীরই হোক বা গ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই হোক—সকল গতিই এক নিয়মে পরিচালিত হয়।

প্রিন্সিপিয়ায় নিউটনের গতির সূত্র বিশ্লেষণ করা হয় বিশদভাবে। প্রথম সূত্রটি হচ্ছে—"যে বস্তু স্থির থাকে, তা বল প্রয়োগে গতিমান না করা পর্যন্ত স্থিরই থাকে। গতিমান বস্তু একই গতিতে এবং একই দিকে অনবরত চলতেই থাকবে, যতোক্ষণ

পর্যন্ত বলপ্রয়োগে গতি পরিবর্তন করা না হয়।" নিউটন উপলব্ধি করেন যে, বস্তুর মধ্যে গতি সঞ্চারের জন্য অবশ্যই একটা শক্তির উপস্থিতি থাকতে হবে। সে গাছ থেকে ফল পতনই হোক বা সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থানই হোক।

আমরা আজকে যে মোটর গাড়ী ব্যবহার করি, ভ্রমণ করি, সেই চলন্ত মোটর গাড়ী হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে কি হয়—তা আন্দাজ করুন! আমরা সামনের দিকে গতিমান হয়ে পড়ি। অর্থাৎ আমাদের বলপ্রয়োগে থামিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমরা গতিমান থাকি। গাড়ীর আসনের সামনে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আমাদের গতি থেমে যায়। এই চিন্তাধারাকে অবশ্য নিউটনে'র পূর্বেও চিন্তা করা হয়েছে, কিন্তু নিউটনই এই চিন্তাধারাকে প্রথম বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করেন এবং স্থির সমাধান দেন।

গতির দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে,—"গতি পরিবর্তনের মাত্রার মধ্য দিয়ে শক্তির পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। গতির পরিবর্তনের মাত্রাকে 'ত্বরণ' বলা হয় এবং বেগ হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে এটা সংশ্লিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—"একটা মোটর গাড়ীকে স্থির অবস্থা থেকে ৫ সেকেন্ডে ঘন্টায় ১৫ মাইল বেগবান করতে যে শক্তির প্রয়োজন হবে, একই সময়ে ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগবান করতে তার চেয়ে অধিক শক্তি প্রয়োজন হবে।"

দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা আরোও দেখতে পাই যে,—"ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে চলন্ত মোটর গাড়ীকে ১০ সেকেন্ডে থামাতে যে শক্তি প্রয়োজন হবে, ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে চলন্ত গাড়ীকে ৫ সেকেন্ডে থামাতেও একই পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হবে।"

গতির তৃতীয় সূত্রটি হচ্ছে—"ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমানুপাতিক ও বিরুদ্ধমুখী।" এর বিবিধ প্রয়োগ সম্ভব। সর্বাধিক আকর্ষনীয় হচ্ছে বর্তমান রকেটের উড্ডয়ন। উষ্ণ বাষ্প যতোই পেছনের দিকে ধাবিত হতে থাকে, রকেট ততোই সামনের দিকে ধাবিত হয়। আপনার বাগানের পানি ছিটানোর যন্ত্রটার প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখবেন ছিটানীর অগ্রভাগটা দিয়ে পানি যতোই বের হতে থাকে, অগ্রভাগটা ততোই পেছনের দিকে পাক খায়।

মাধ্যাকর্ষণের বিশ্বজনীন সূত্র অতি বিস্ময়কর। নিউটন বলেন যে,—"বস্তুর প্রতিটি কণা অপর প্রতিটি কণাকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীই শুধু গাছের ফলকে আকর্ষণ করে না, ফলও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। সকল গ্রহের ক্ষেত্রেই এই সূত্র প্রযোজ্য। সূর্য পৃথিবীকে টেনে রাখে, আবার চন্দ্রও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে।" তিনি আরো বলেন যে,—"বিভিন্ন বস্তুর মধ্যকার শক্তি, বস্তুর আকৃতির উপর এবং পারস্পরিক দূরত্বের উপর নির্ভরশীল।" এই শক্তির পরিমাণ কিভাবে হিসাব করতে হয়, তাও তিনি প্রদর্শন করেন।

'প্রিন্সিপিয়া'র দ্বিতীয় খন্ড প্রথম খন্ডেরই বিশ্লেষণ শুধু নয়। এতে গতির প্রতিবন্ধকতাসংক্রান্ত চিন্তাধারাও প্রকাশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—কোন্

আকৃতির জাহাজ সামান্যতম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে তাও তিনি আলোচনা করেন। দ্বিতীয় খন্ডে তরঙ্গের গতির গাণিতিক আচরণের বর্ণনা দেন তিনি। তাঁর এই বর্ণনা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

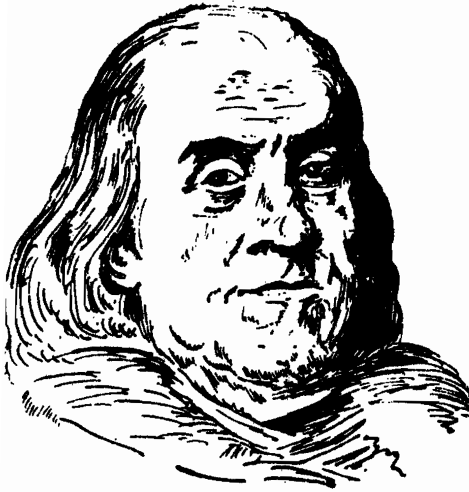
'প্রিন্সিপিয়া'র তৃতীয় খন্ড মানব জাতির বুদ্ধিমত্তার অনন্য সাধারণ বিজয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পৃথিবীমুখী বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিউটন গতি ও মাধ্যাকর্ষণের নীতিসমূহ উদ্ভাবন করেন এবং এই নীতিগুলোকে পৃথিবীসহ সূর্যের চতুর্দিকে অবস্থিত গ্রহসমূহের উপর প্রয়োগ করেন। তিনি সূর্য ও পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করেন। 'পৃথিবী মেরুদ্বয়ে চেপ্টা এবং নিরক্ষরেখা বরাবর স্ফীত'—অঙ্কের হিসাবে এটা কি করে বের করতে হবে, তাও তিনি দেখিয়ে দেন। পৃথিবী পরিভ্রমণে চন্দ্রের কক্ষপথের প্রধান টলনগুলো সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেন এবং সূর্যপিন্ডের আকর্ষণের দরুণ কি করে টলন হয়, সেটাও সঠিকভাবে প্রদর্শন করেন। পৃথিবীর জলভাগের উপর চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ তিনি বিশ্লেষণ করেন এবং জোয়ার-ভাটার 'গাণিতিক তত্ত্ব' আবিষ্কার করেন।

নিউটন পদার্থের মধ্যে আকর্ষণের তত্ত্ব প্রচার করলেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণ আলোচনায় বিরত থাকেন। তবে এই ব্যাপারে তিনি বলেন যে,—"মাধ্যাকর্ষণের সত্যি সত্যিই অস্তিত্ব রয়েছে এবং আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেই সূত্র অনুযায়ী কাজ করে—এবং সমুদ্র ও নভোমন্ডলের বস্তুসমূহের সকল গতির ব্যাখ্যাদানের জন্য পর্যাপ্ত—এটাই মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে যথেষ্ট।"

'প্রিন্সিপিয়া'র মাধ্যমেই নিউটন বিজ্ঞানীরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এরপরও তিনি অনেক বিজ্ঞানের নিবন্ধ রচনা করেন। এর অধিকাংশই 'আলোক বিজ্ঞান' সম্পর্কিত নিবন্ধ। উচ্চতর বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর তথ্যাবলীও তিনি বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেন।

১৬৯৯ সালে তিনি টাকশালের মাস্টার নিযুক্ত হন এবং মুদ্রাকে নকল প্রতিরোধক করে প্রস্তুতের জন্যে সংস্কার কাজ তত্ত্বাবধান করেন। ১৭০৩ সালে তিনি 'রয়াল সোসাইটি'র সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। মৃত্যু পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৭০৫ সালে রাণী অ্যানে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৭২৭ সালে ৮৫ বছর বয়সে স্যার আইজ্যাক নিউটন পরলোক গমন করেন। 'ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি'তে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি সকল যুগের এক অনন্যসাধারণ বিজ্ঞানী। পূর্বসূরীদের অবদান তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন,—"কৃতী বিজ্ঞানীদের কাঁধে ভর দিয়েই আমি আরো-আরো বেশী অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছি।"



বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

জন্মঃ বস্টন ১৭০৬
মৃত্যুঃ বস্টন ১৭৮২



একদা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন—ডার্লিং ডেবি, আমার ইচ্ছে, মহান প্রভু যিশু যদি প্রতিটি দিনকে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ বড়ো করে দিতেন। সম্ভবতঃ তাহলেই আমি সত্যিকারভাবে কিছু অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারতাম।

সত্যিকারভাবে কী কিছু সমাধা করে যেতে পারতেন? কিন্তু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে বহু কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। বিজ্ঞানে, আবিষ্কারে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, প্রকাশনায়, সমাজ সেবায় এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে তাঁর অবদান বিরাট। দিনটি যদি দ্বিগুণ, অথবা এমন কি তিন গুণও অধিক বৃদ্ধি পেতো, তাহলে তিনি আর এমন কিই বা করতে পারতেন?—না, তিনি প্রভু যিশু'র থেকে ২৪ ঘন্টায় ১ দিন হিসাবের ১ মিনিট বেশী সময় পাননি, তবুও বিশ্বকে দিয়ে গেছেন অনেক বেশী।

১৭০৬ সালের ১৭ই জানুয়ারীতে ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জ 'ম্যাসচুস্টেস্ কলোনী' বস্টনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আরো ১৪ জন বড়ো ভাইবোন ছিলেন। মৃতদের নিয়ে ভাইবোনের সংখ্যা ছিলো ১৭ জন। তাঁর পিতা বাতি তৈরির কাজ করতেন। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, পেশাটা অর্থকরীভাবে মোটেই লাভজনক ছিলো না।

বেঞ্জামিন নিজে-নিজেই পড়তে শেখেন। ৮ বছর বয়সে তাঁকে ইস্কুলে ভর্তি করা হয়। দু'বছর পর তাঁর ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সেকালে ইস্কুলগুলো অবৈতনিক ছিলো না। বেঞ্জে'র পিতা ইস্কুলের খরচ চালাতে অসমর্থ হয়ে

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে নিজের বাতি তৈরির দোকানে কাজে লাগিয়ে দেন। বেঞ্জ দোকানে চঞ্চল ও অস্থির হয়ে পড়েন। বস্টন পোতাশ্রয়ে তিনি প্রতিদিন ঘোরাফেরা করতে থাকেন এবং সমুদ্রযাত্রার খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। এতে পিতা ফ্রাঙ্কলিন হুঁশিয়ার হয়ে যান এবং বেঞ্জকে মুদ্রাকরের কাজ শেখানোর জন্যে পুত্র জেমস্‌'কে নির্দেশ দেন। ভ্রাতা জেমস্‌ 'দি নিউ ইংল্যান্ড কোর‍্যান্ট' নামে একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন। ১২ বছরের বেঞ্জ এই কাজের মধ্যে সাময়িকভাবে আনন্দ লাভ করেন। তিনি হরফ সাজানো এবং মুদ্রণ যন্ত্র চালনা শিক্ষা লাভ করেন।

কোনো কিছু শিক্ষালাভের জন্যে ফ্রাঙ্কলিন গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। আশেপাশে যতো বই তিনি পেতেন তাই তিনি পড়ে ফেলতেন, প্রায়ই না খেয়ে পয়সা জমিয়ে বই কিনতেন। এই প্রতিভাবান বালক নিজে-নিজেই অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত, ব্যাকরণ এবং নৌ-চালনা শিক্ষালাভ করেন। তিনি লেখার ক্ষমতাও ভালোভাবে আয়ত্ত করেন। তাঁর মৃত্যুরপর তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। তাঁর আত্মজীবনী মার্কিন সাহিত্যের এক অন্যতম ক্লাসিক প্রকাশনা বলে আদৃত।

'দি নিউ ইংল্যান্ড কোর‍্যান্টে' নিজের লেখা ছাপার জন্য তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাই তাঁকে বেশী গুরুত্ব দিতেন না। তাই তিনি 'মিসেস সাইলেন্স ডগ্‌উড্‌' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। জেমসের নিকট মিসেস সাইলেন্স পরিচয় উদঘাটিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায় এবং তিনি ভাইয়ের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলেন। তাই ফ্রাঙ্কলিন নিজেই-নিজের পথ করে নেওয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। অতঃপর ১৮ বছর বয়সে রাগ করে তিনি 'ফিলাডেলফিয়া' অঙ্গরাজ্যে চলে যান।

ফিলাডেলফিয়ায় মুদ্রাকররূপে তাঁর প্রতিভা দ্রুত পরিচিত লাভ করে এবং তার চাহিদা বেড়ে যায়। তিনি নিজেই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। সে সময় এ্যামেরিকার উপনিবেশগুলোতে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি তৈরি হতো না, ইংল্যান্ড হতে আমদানী করতে হতো। পেন্‌সিলভ্যানিয়ার ঔপনিবেশিক গভর্ণর স্যার ইউলিয়াম কীথের থেকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফ্রাঙ্কলিন ছাপাখানার যন্ত্রপাতি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে একদিন ইংল্যান্ড রওয়ানা হন।

অবশ্য যে কারণেই হোক, প্রতিশ্রুত অর্থ পাওয়া গেলো না। নিজ ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফ্রাঙ্কলিন দেড় বছর ইংল্যান্ডে বিভিন্ন কাজ করেন। এদিকে স্বদেশে ফিলাডেলফিয়ায় তাঁর কোনো খবর বার্তা না পেয়ে তাঁর প্রেমিকা, ডেবিরী রীড অন্য এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। অবশ্য কয়েক বছর পরে স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বেঞ্জামিন ও ডেবিরী নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের ঔরসে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে এসে তিনি 'পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া গেজেট' প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি বার্ষিক 'পুয়র রিচার্ডস অ্যালম্যাক' প্রকাশ করতে থাকেন।

'অ্যালম্যাক'টা ছিলো একটা পঞ্জিকা। এতে সূর্যোদয়, চাঁদের বিভিন্ন পর্যায়ক্রম, দীর্ঘমেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ধর্মীয় পবিত্র দিনসমূহের নির্ঘন্ট—রাষ্ট্রিয় উত্থান-পতন প্রভৃতি তথ্যও দেওয়া হতো। এবং ঐ পঞ্জিকায় সততা, শিল্প, মিতব্যায়িতা, সাহিত্য এবং দেশপ্রেম সম্পর্কে অনেক সংক্ষিপ্ত উপদেশবাণী স্থান পেতো। এর কয়েকটি আজকের দিনেও বহুল প্রচলিত

এখানে তা থেকে ক'টি নমুনা ছাপা হলো।

★ 'ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন, যারা
নিজেরা নিজেদের সাহায্য করে।'

★ 'সকাল সকাল শয্যাগ্রহণ এবং সকাল
সকাল শয্যাত্যাগ মানুষকে স্বাস্থ্যবান,
বিত্তশালী ও জ্ঞানবান করে।'

★ 'আজকেই যা করতে পার, আগামী দিনের
জন্য তা রেখে দিও না।'

★ 'রাতে এক ঘন্টা অধ্যয়ন
সমস্তরাত প্রার্থনার চাইতেও উত্তম।'

তিনি ৪২ বছর বয়সে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। যার ফলে তিনি ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণে এবং সম্পূর্ণরূপে জনসেবায় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগে সমর্থ হন। অবশ্য ছাপাখানার ব্যবসায়ে থাকাকালেই তিনি এসব তৎপরতার সাথে লিপ্ত ছিলেন।

মাত্র ২১ বছর বয়সে ফিলাডেলফিয়ার তরুণ যন্ত্রবিদ ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে তিনি একটা আলোচনাচক্র গঠন করেন। এই চক্র ফিলাডেলফিয়ার বাইরেও সম্প্রসারিত হয়। এই চক্রই পরবর্তী সময়ে 'এ্যামেরিকান ফিলোসোফিক্যাল সোসাইটি'তে পরিণত হয়। এই সোসাইটিতে তৎকালীন উপনিবেশ সমূহের সেরা জ্ঞানীগুণী সৃজনশীল কর্মের অধিকারী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিলো। তাঁরা গোপন যোগাযোগের বিভিন্ন কমিটি সংগঠন করেন। এই গোপন সংস্থাগুলোই স্বাধীনতার ঘোষণা ও এ্যামেরিকান বিপ্লবের প্রেরণা সৃষ্টির ঘাঁটি পত্তন করে। এখনো ফিলাডেলফিয়ার সোসাইটির ভবনটি মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৭৫৩ সালে উপনিবেশসমূহের "পোস্টমাস্টার জেনারেল"-এর পদে চাকুরী লাভ করেন। নতুন কাজেও তিনি তাঁর স্বাভাবিক শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় দেন। বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে ডাক সার্ভিসকে তিনি ব্যাপকভাবে উন্নত করেন এবং ডাক বিভাগকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করেন। ১৮৪৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ডাক টিকেট ছাপা হলে. তাতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন -এর ছবি শোভা পায়; মার্কিন মুল্লুকের ডাক বিভাগের উন্নয়নে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এটা করা হয়।

২৫ বছর বয়সে ফ্রাঙ্কলিন এ্যামেরিকার প্রথম ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। কিশোর বয়সের কথা তাঁর মনে ছিলো, যখন তাঁকে না খেয়ে বই কিনতে হতো। তিনি ফিলাডেলফিয়ায় অগ্নি নির্বাপণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এ্যামেরিকার প্রথম "অগ্নি-বীমা কোম্পানী" প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। 'পেন্‌সিলভ্যানিয়া একাডেমী' প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সাহায্য করেন। এই একাডেমী পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ফিলাডেলফিয়ার নেতৃস্থানীয় নগরীর মর্যাদা লাভের পিছনে এই মহান ব্যক্তিত্বের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আজ তিনি বিজ্ঞান জগতের এক প্রাতঃ স্মরণীয় মহান নাম।

ফ্রাঙ্কলিন ৩৮ বছর বয়সে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন। ব্যবসায় এবং সরকারী পদে ইতিমধ্যেই তিনি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। 'তড়িৎ স্থিতিশীলতা' সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালান।

ঝড় ও বজ্রপাতের মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর কাহিনী সবাই শুনেছেন। এই ঘুড়ি ওড়ানোর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে,—বজ্রবিদ্যুৎ ছাড়া অভিন্ন কিছুই নয়। এ্যামেরিকার প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে এই কাহিনী সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সেখানে প্রচলিত অন্যান্য প্রবাদ কাহিনীর মতো অলীক নয়, এ কাহিনী সত্যি। তদানীন্তন সময়ের সায়েন্টিফিক জার্নালে তিনি এই কাহিনী প্রকাশ করেন এবং বিশ্বব্যাপী বহু বৈজ্ঞানিক তাঁর পরীক্ষা বিধি-বিধান পুনরায় পরীক্ষা করে দেখেন, ঘটনাটি সত্যি।

বেঞ্জামিনের 'তড়িৎ স্থিতিশীলতার তত্ত্ব' মূলতঃ সহজ এবং অদ্যাবধি আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। তিনি বলেন,—"সকল বস্তুই, 'সাধারণ পদার্থ' এবং 'বৈদ্যুতিক পদার্থ' অথবা 'বৈদ্যুতিক তরল' উপাদানে গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই নির্দিষ্ট পরিমাণে তরল বিদ্যুৎ অবস্থান করে।" তিনি আরও বলেন,—"বস্তু কিছুটা 'তরল বিদ্যুৎ' গ্রহণ বা বর্জন করলে বস্তু বিদ্যুতায়িত বা সঞ্চারিত হয়। বস্তু যদি তরল বিদ্যুৎ গ্রহণ করে, তাহলে এতে 'ধনাত্মক বিদ্যুৎ' সঞ্চারিত হয়। অপর দিকে বস্তু যদি তরল বিদ্যুৎ বর্জন করে তাহলে তাতেও বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়।"

আজকাল আমরা জানি যে, সকল বস্তুই 'ইলেকট্রন' ও 'প্রোটন' দ্বারা বিন্যস্ত এবং বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়নি এমন বস্তুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সমসংখ্যায় অবস্থান করে। এই আধুনিক ধারণাও ফ্রাঙ্কলিনের তত্ত্বের অনুরূপ।

বেঞ্জামিন তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। যখন এক খন্ড কাঁচকে রেশমী কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করা হয়, তখন কাঁচে 'ধনাত্মক' এবং কাপড়ে 'ঋণাত্মক' তড়িৎ সঞ্চারিত হয়। অনেক বিজ্ঞানী মনে করতেন যে—'ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়।' কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন জোর দিয়ে বলেন, —"না, এতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় না, বরং রেশমী কাপড় থেকে তরল বিদ্যুৎ কাঁচের মধ্যে প্রবাহিত হয়।" ফ্রাঙ্কলিনের ধারনাই সঠিক ছিলো।

বেঞ্জামিন তাঁর 'তরল বিদ্যুৎতত্ত্ব'-এর নাটকীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তিনি দু'জন লোককে টুলের উপর দাঁড় করান। কাঁচের সাহায্যে তাদের ভূমি থেকে আলাদা

করে রাখা হয়েছিলো। একজনকে 'ধনাত্মক বিদ্যুৎ' দ্বারা চার্জ করা হলো, অর্থাৎ তার মধ্যে 'তরল বিদ্যুৎ' বেশী হলো। অপরজনকে 'ঋণাত্মক বিদ্যুৎ' দ্বারা চার্জ করা হলো, অর্থাৎ তার মধ্যে 'তরল বিদ্যুতের' পরিমাণ হ্রাস পেলো। যখন তারা পরস্পরকে স্পর্শ করলো তখন তাদের মধ্যে চার্জ হয়ে গেলো এবং উভয়েই ধাক্কা খেলো। কারণ একজনের অতিরিক্ত 'তরল বিদ্যুৎ' ঘাটতি দূর করার জন্য অন্যজনের মধ্যে তা প্রবাহিত হয়। বিদ্যুৎ সঞ্চারিত বা চার্জ করা হয়নি, এমন তৃতীয় ব্যক্তিও যদি যেকোনো একজনকে স্পর্শ করে, তবে সেও ধাক্কা খাবে। কারণ, 'ঋণাত্মক' চার্জ করা ব্যক্তির তুলনায় তার মধ্যে অধিক এবং 'ধনাত্মক' চার্জ করা ব্যক্তির তুলনায় কম 'তরল বিদ্যুৎ' রয়েছে।

ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণার ফলে বজ্রদন্ড আবিষ্কার করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে,—বিদ্যুতায়িত বস্তুর নিকট সূক্ষ্ম অগ্রভাগ যুক্ত দন্ড থাকলে, দন্ড বস্তু থেকে বিদ্যুৎ টেনে নেয়। তিনি জানতেন যে, মেঘের মধ্যেও বিদ্যুৎ রয়েছে। তাই তিনি দালানের সর্বোচ্চ স্থানে সূক্ষ্ম অগ্রভাগ যুক্ত লৌহদন্ড স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং একটি তার লৌহদন্ড থেকে মাটির তলায় নিয়ে যেতে বলেন। এর ফলে বজ্রপাত থেকে ইমারত রক্ষা পাবে। এই পদ্ধতি আমাদের দেশেও বাধ্যতামূলক। লৌহদন্ড মেঘ থেকে ধীরে-ধীরে বজ্রের বিদ্যুৎ টেনে নেবে,—ফলে আকস্মিকভাবে প্রচন্ড আকারে বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকবে না। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র এটা প্রচলিত।

বেঞ্জামিন 'লেডেনপাত্র' (Layden jar) সম্পর্কেও গবেষণা করেন। সে সময় বৈদ্যুতিক চার্জ সংগ্রাহকরূপে সার্বজনীনভাবে লেডেনপাত্রের ব্যবহার হতো। লেডেনপাত্র আসলে সাধারণ কাঁচপাত্র'। তবে এটা উপরিভাগে ধাতব আচ্ছাদনযুক্ত। পাত্রের ভিতরে পানি দিয়ে ভর্তি থাকে। লেডেনপাত্রের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ফ্রাঙ্কলিন বিজ্ঞান জগৎকে আশ্চর্য করে দেন। তিনি লেডেনপাত্র থেকে পানি ফেলে দিয়ে তাতে নতুন পানি ঢেলে দেন। লেডেনপাত্র তখনও বিদ্যুৎ চার্জ করা ছিলো। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন যে,—"পানি নয়, কাঁচই বিদ্যুতের উৎস।" কিন্তু এককালে ধারণা ছিলো,—'পানিটাই বিদ্যুতের উৎস।' এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি সমান্তরাল 'ক্যাপাসিটর' পাত উদ্ভাবন করেন, যা আজকের দিনের রেডিও টেলিভিশনে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

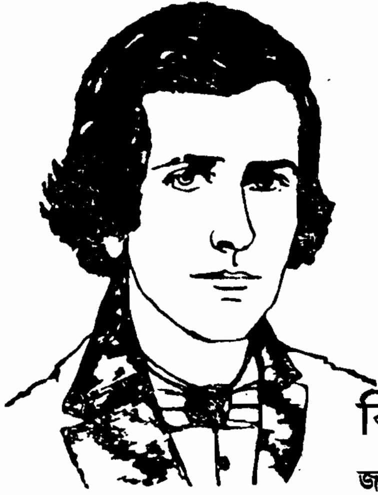
তাঁর 'এক্সপেরিমেন্টস্ এন্ড অবজারভেশন্ অন ইলেক্ট্রিসিটি মেইড অ্যাট ফিলাডেলফিয়া ইন এ্যামেরিকা' গ্রন্থটি গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ। এই গ্রন্থে বিদ্যুৎ সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কৃত নীতিসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র এই গ্রন্থ প্রচার ও প্রকাশিত হয়েছে এবং জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে-সাথেই।

বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরা তাঁর গ্রন্থকে স্যার আইজ্যাক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে সময় একটি সাময়িকীতে মন্তব্য করা হয়,—"ডঃ ফ্রাঙ্কলিনের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ বিদ্যুতের ক্ষেত্রে 'প্রিন্সিপিয়া' সৃষ্টি করেছে এবং অনুরূপ সমান সহজ ও নিগূঢ় পদ্ধতির ভিত্তি গঠন করেছে।"

ফ্রাঙ্কলিনকে তাঁর কর্মের জন্যে বৈজ্ঞানিক সর্ববিধ মর্যাদায় সম্মানিত করা হয়। ফ্রাঙ্কলিন লন্ডনের 'রয়্যাল সোসাইটি'র এবং প্যারিসের 'রয়্যাল একাডেমী'র সদস্য নির্বাচিত হন। বিদ্যুতের 'একক-তরল' তত্ত্ব তারই অবদান। আজকের দিনে আমরা বলি যে,—বিদ্যুৎপ্রবাহ আসলে প্রবহমান ইলেকট্রন-এর সমষ্টি—কিন্তু সত্যিটা হলো,—'এখনো একক তরল' তত্ত্বই কার্যকরী।

যাবতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিজ্ঞান বিষযক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার কাজ করেও তিনি জনকল্যাণের জন্য সময় ব্যয় করতেন। এ্যামেরিকান বিপ্লব চলাকালে মহাদেশীয় কংগ্রেস টমাস জেফারসন্, জন অ্যাডাম্‌স এবং বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে নিয়ে গঠিত কমিটির উপর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরির মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এ্যামেরিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একজন কৃতীপুরুষ। অপরদিকে তাঁর বিদ্যুৎ সম্পর্কিত তত্ত্ব তাঁকে বিশ্ব বিজ্ঞান ভুবনের দিকপালের আসনে সমাসীন করেছে সম্মানের সাথে।



বিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোল্ট

জন্মঃ ১৯ই জুলাই ১৮১৪
মৃত্যুঃ ১০ই জানুয়ারী ১৮৬২



১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সোনাঝরা এক শীতের বিকেল। কোলকাতা (বর্তমান ভারত) শহরের এক বন্দুকের দোকান। সাপ্তাহিক নিয়মে দোকানটি যথারীতি খোলা বিক্রির জন্যে। সেই দোকানের কাঁচের আলমারীর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে মাত্র ১৬ বছরের এক যুবক নাবিক। খিদিরপুর ডক-এ নোঙর করা বিশাল সামুদ্রিক জাহাজ তখন তার মনের অনেক দূরে। এই যুবকেরই নাম,—স্যামুয়েল কোল্ট। নাবিক পা-দুটি সৈনিকের ভঙ্গিতে একটু ফাঁক করে শক্তভাবে একঠাঁয় দাঁড়িয়ে। লোভ সামলাতে না পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে দোকানের ভেতর তাকালো—যদিও দেখলে মনে হবে সে বুঝি জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচের আলমারীতে বিক্রয়ের জন্য সাজানো একটা চকমকি-ঘোড়া অঙ্কিত পিস্তলের প্রতি তার দৃষ্টি আটকে আছে। নাবিক হয়ে বহু দেশ ভ্রমণ করলেও এমন অদ্ভুত, আশ্চর্য বন্দুক সে আগে দেখেনি।

বোস্টন থেকে আগত দুই মাস্তুলবিশিষ্ট এই বাণিজ্যিক-জাহাজের নাম 'কার্ভো'। স্যাম তখনো একজন আনাড়ী ডেক সহকারী। এটাই তার প্রথম দূরদেশ—মানে, ভিন্ন এক মহাদেশে সমুদ্র যাত্রা।এর আগে আভ্যন্তরীণ সমুদ্রযাত্রা আর জন্মভূমি নিউ ইংলন্ডের গ্রাম ও পাহাড়-পর্বত থেকে দূরে কোথাও যাওয়া হয়নি। কিন্তু আজ সেই যুবক পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা ঘুরে ঘুরে তার দাদীমার কাছে শোনা—যাদুর দেশে এসে

হাজির। সমস্তদিন সে কলকাতার জনবহুল রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে কাটিয়েছে। তার কাছে কলকাতা এক রূপকথার শহর। এখানে এমন অনেক অপরিচিত দৃশ্য সে দেখতে পেলো, যা দেশে ফেরার পর বছরের পর বছর ধরে তার বন্ধু-বান্ধবীদের জন্যে গল্পের খোরাক হবে।

তবু সমস্ত কলকাতার মধ্যে বন্দুকের দোকানের আলমারীতে রক্ষিত সেই চকমকি পিস্তলের মতো আর কিছুই তাকে তেমন মুগ্ধ করতে পারেনি। বন্দুকটি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে দোকানে ঢুকে সে দেখতে পেলো,—এটা যতোটুকু অসাধারণ মনে হয়েছিলো আসলে তার চেয়েও অনেক বেশি অদ্ভুত!

দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন,—'আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে কিছু জানো?'

স্যাম মাথা নেড়ে উত্তর দিলো,—'না'।

—'এতো ভালো কথা। তবে আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ঠিক এটার মতো আরেকটা পিস্তল তুমি এর আগে দেখোনি। দেখো বাছা, এ অস্ত্রটায় কৌশলের বাহার আছে ঠিকই, তবে এটা তেমন খুব একটা কাজের নয়। এই দেখো,—তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

—'এ পিস্তলটা 'এলিশা কোলিয়ের' নামক এক মার্কিন বন্দুক-মিস্ত্রীর আবিষ্কার'—স্যাম একথা দোকানদারের কাছে শুনলো। দোকানী আরো বললো—'পুনরায় গুলী না ভরে পর-পর ছয়বার গুলী করার ব্যবস্থা করেই এটা তৈরি করা হয়েছে। আর সেজন্যেই এটা অদ্ভুত।' দেখা দূরে থাকুক, স্যাম কোনোদিন এ রকম বন্দুকের নামও শোনেনি।

কেনো এটা খুব কাজের নয় তা ব্যাখ্যা করার জন্যে যখন দোকানদার পিস্তলটার নানা অংশের বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন সে ভালো তা লক্ষ্য করলো।—'এটা জটিল, ব্যবহার করতে কষ্টকর এবং নির্ভরশীল নয়। একথা সত্যি, এতে ছয়টা গুলী ভরা যায়; কিন্তু গুলী ভরতে এতো সময় লাগে যে, এটা কখনোই একটা সাধারণ বন্দুককেও হার মানাতে পারবে না। মাঝে-মাঝে দুর্ঘটনাক্রমে ছয়টা গুলীই এক সঙ্গে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে বেরিয়ে পড়ে। তাতে লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে এটা তার মালিকের জন্যেই বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া কোলিয়েরের চকমকি-বন্দুকের মতো বন্দুক এখন অচল হয়ে পড়েছে। তেমন কোনো চাহিদা নেই।'

বন্দুকের ব্যবসায়ী আরো বললেন,—'মিঃ কোলিয়েরের এতো পরিশ্রম সত্ত্বেও তাঁর পিস্তল যতো না মূল্যবান তার চেয়ে বেশি বিরক্তিকর। যখন একজন লোক একটা

বন্দুকের উপর তার জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে নির্ভর করেন, তখন তিনি নিশ্চিত হতে চান যে, সেটা নির্ভরশীল কি না। এক সময়ের এই ভারতবর্ষেই বৃটিশ অফিসারগণ এসব পিস্তল ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন আর এটা তারা ব্যবহার করেন না। এখন এগুলো সখের বিলাস সামগ্রী সংগ্রহকারীদের 'এন্টিকস্' হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

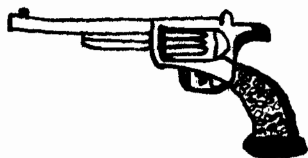
দোকানদার পিস্তলটা একটু পালিশ করে আবার রেখে দিলেন এবং বললেন,— 'তবুও বলতে হবে, কোলিয়ের একজন চতুর বন্দুক-মিস্ত্রী ছিলেন; কারণ, প্রতিবার না ভরে বারকয়েক গুলী করার চিন্তাধারাটা তাঁর খুবই ভালো। তাঁর ভাগ্য যদি আরো একটু সহায় হতো, তাহলে তাঁর বড়োলোক হতে বিন্দুমাত্র দেরি হতো না—কেমন ঠিক বলেছি না? কি বলো খোকা?'

স্যামও কথাটা স্বীকার করলো। সে দোকান থেকে বের হয়ে ধীর পায়ে তার জাহাজে ফিরে গেলো। সমস্ত পথে সে কেবল সেই পিস্তলটার কথাই ভাবছিলো। বিছানায় শুয়ে গভীর রাত পর্যন্ত সে কোলিয়েরের এই আবিষ্কারের ত্রুটির ব্যাপারটি নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা করলো। যদি কেউ নিখুঁত ও কাজের উপযোগী একটা বন্দুক আবিষ্কার করতে পারে, যা থেকে একবার ছয়টা গুলী ভরে পরপর ট্রিগার টিপে ছোঁড়া যায়, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, সে ভেবে পেলো না। দোকানদার যেমন বলেছেন, হয়তো তার কথাই ঠিক হবে। ঐ বন্দুকের আবিষ্কারক রাতারাতি বড়লোক হয় যাবে!

পরদিন ভোরে 'কার্ভো' জাহাজ নোঙর তুলে পুরো পাল খাঁটিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়লো। স্যাম তখনো কোলিয়েরের পিস্তলের কথাই ভাবছিলো। জাহাজ অবিরাম গতিতে ভারত মহাসাগর পার হয়ে, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে, উত্তরদিকে মোড় নিয়ে আফ্রিকার তীর ধরে ইংলন্ডের দিক পাড়ি জমালো। তখনো সেই অদ্ভুত পিস্তলের কথা স্যামের মাথায় কিলবিল করছিলো। সে বুঝতে পারলো, অনেক লোকের চেয়ে সে আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বেশি জানে। তাই সে অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করলো,— এলিশা কোলিয়েরের চেয়ে সে আরো ভালো কিছু তৈরি করতে পারবে কিনা। এবং সে সেই চেষ্টাই করবে বলে মনস্থির করলো।

প্রায় সব নাবিকের মতো স্যামও ডেকে'র উপর বসে কাঠ দিয়ে অদ্ভুত সব জিনিস-পত্তর তৈরি করে তার অবসর সময়ের বেশির ভাগ কাটিয়ে দিতো। একদিন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। নতুন একখন্ড কাঠ পেয়ে সে তার পকেটের চাকুটা ভালো করে একটু শান দিয়ে সেই কাঠ দিয়ে একটা বন্দুকের মডেল তৈরি

করতে লেগে গেলো একাগ্র চিত্তে। সেই মডেলটাই 'পশ্চিম-জয়ী বন্দুক' বা 'কোল্ট রিভলভারে'র আদি নমুনা বলে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে।



পশ্চিম-জয়ী বন্দুক কোল্ট/রিভলভারের আদি নমুনা

আজকের যুবক-নাবিক স্যামুয়েল কোল্ট আট বছর বয়স থেকেই বন্দুক নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছিলো। তার জীবনে প্রথম পিস্তল সে পেয়েছিলো সেই বয়সেই। এটাও একটা চকমকি ঘোড়াযুক্ত পিস্তল। ভারতের বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে তার পিতামহ এটাই ব্যবহার করেছিলেন। এটা এতো বড়ো আর ভারি ছিলো যে, কিশোর স্যাম ওটা এক হাতে ঠিক মতো ধরে তুলতে পরতো না পর্যন্ত।

অবশ্য পিস্তলটা তার বড়োভাই জন্‌কে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু অনেকদিন থেকেই স্যামের নজর ওটার উপর। তবে পিস্তলটা ছিলো ভাঙা আর মরচে-ধরা। বিপ্লবের পরে এটা বোধহয় কোনোদিনই আর কাজে লাগানো হয়নি। তা সত্ত্বেও, সহজে জন্‌ এটা হাতছাড়া করতে রাজী নয়। তাই স্যাম সেটা ক্রয়ের জন্যে তার বড়োভাইয়ের সঙ্গে ক্রেতা হয়ে দর-কষাকষি শুরু করে দিলো।

স্যাম বললো,— 'ওটার বদলে আমি তোমাকে আমার মূল্যবান শিকারের ছুরিটা দেবো।'

—'শিকারের ছুরি! ওটা আবার শিকারের ছুরি হলো কবে থেকে? ও দিয়ে একটা পাউরুটি পর্যন্ত কাটা যাবে না! আর সেটাকেই বলছো, মূল্যবান শিকারের ছুরি?'

—আচ্ছা, তবে আমার বরফে-চলার স্কেটগুলোও দেবো ছুরিটার সাথে।' বড়োভাই জনের উত্তর,—'ভাগো এখান থেকে! দাদু আমাকে পিস্তলটা দিয়েছেন। ওটা দাদুর প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমি নিজের কাছেই রাখতে চাই।'

স্যাম কিন্তু তাতেও হতাশ হলো না। স্যাম আবার বললো,—'আমার শিকারের ছুরি, বরফে-চলার স্কেট ছুরি, আর আমার স্লেজ গাড়ি এগুলো সব আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। কি বলো, এবার দেবে?'

জন্‌ এবারও মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো। স্যামের বড়োভাই তার থেকে আরো সুবিধা আদায়ের ফন্দিতে গ্যাট ধরে রইলো।

শেষ চেষ্টা হিসেবে স্যাম-পুরো এক মাস কুয়ো থেকে পানি তুলে দেবে বলে অঙ্গীকার করলো। কারণ, স্যাম জানে তার ভাই এ কাজটাকে ঘৃণা করে। এবার ঔষধে ধরলো, স্যাম পিস্তলটা পেয়ে গেলো এবার। জন্ মনে করলো, খুব ঠকিয়ে দিয়েছে স্যামকে। কিন্তু স্যাম ঠিক তার উল্টোটা প্রমাণ করে ছাড়লো। স্থানীয় এক বন্দুক-মিস্ত্রীর কাছে পিস্তলটা নিয়ে গিয়ে স্যাম পিস্তলটার বিভিন্ন অংশ খোলার কৌশল শিখে নিলো। তারপর কিছু খুচরো যন্ত্রাংশ জুড়ে শেষে সেই মিস্ত্রীর সাহায্যেই সে ওটাকে আবার কাজের উপযোগী করে তুললো।

তখনকার দিকে খুব ছোটো বয়সেই ছেলেরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে শিখতো। কিন্তু তাই বলে স্যামের মতো এতো ছোটো হবে, এটা কেউ মনে করতো না কখনোই। মেরামত-করা পিস্তলটা স্যামের হাতে দেখে তার মা ওটা তার কাছ থেকে নিজের হেফাজতে নিয়ে যেতে চাইলেন। স্যাম এমন হৈ-চৈ শুরু করে দিলো যে, তার মা ওটা আর তার কাছ থেকে নিতে পারলেন না; তবে তার মা একটা শর্ত দিয়ে স্যামকে বললেন,—'উপযুক্ত বড়ো না হওয়া পর্যন্ত ওটা থেকে গুলী ছুঁড়বে না। মানে, বড়ো ভাইয়ের মতো বয়স হলেই ব্যবহার করতে পারবে, কী রাজী?' স্যাম মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করলো। মা'য়ের দেয়া কথা মতো যথেষ্ট বড়ো না হওয়া পর্যন্ত স্যাম ওটা দিয়ে গুলী ছুঁড়বে না।

স্যাম 'হার্টফোর্ডে' বড়ো হতো লাগলো। ওখানে তার বাবা ক্রিস্টোফার জাহাজের ব্যবসায়ে কিছুটা ধনী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু স্যাম ছোটো থাকতেই ১৮১২ সালের যুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটে তার বাবা সব কিছু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। তার কিছুদিন পরেই মানসিক কষ্ট ও অর্থাভাবে তার মা মারা গেলেন। পাঁচটি ছোটো বাচ্চার রক্ষণাবেক্ষণের ভার একা বাবা মিঃ ক্রিস্টোফার কোল্টে'র উপর বর্তালো। ওদিকে আবার অভাবের সময় নেয়া বন্ধু-বান্ধবদের টাকার দেনা তাঁকে পরিশোধ করার ব্যাপারেও সর্বক্ষণ প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিলো।

স্যামের মায়ের মৃত্যুর বছর দুই পরে মিঃ ক্রিস্টোফার বিয়ে করে আবার একটা নতুন ব্যবসায়ে হাত দিলেন। 'ম্যাসাচুসেটস্'-এর 'ওয়েআর্' নামক স্থানে তিনি এ্যামেরিকার প্রথম রেশম কারখানাগুলোর একটি স্থাপন করলেন। মিলের জন্যে তাঁকে অনেক বেশি পরিমাণে ঋণ করতে হয়েছিলো। তাই তিনি স্থির করলেন,—তাঁর নতুন ব্যবসা রীতিমতো চালু না হওয়া পর্যন্ত কয়েকটি সন্তানকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন।

তখন স্যামের বয়স মাত্র এগারো। 'কানেক্টিকাটে'র 'গ্ল্যাস্টনব্যারী'র নিকটবর্তী এক নিঃসন্তান চাষী দম্পতির কাছে স্যামকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ওখানে সে স্থানীয় ইস্কুলে পড়বে আর খামারে কাজ করে নিজেই তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। এর পুরনো সব ব্যক্তিগত জিনিষপত্র একটা পুঁটলিতে বেঁধে বাড়ি ত্যাগ করলো সে।

পুঁটলিতে ছিলো,—তার কিছু কাপড়-চোপড়, একখানা পবিত্র বাইবেল আর তার সেই প্রিয় পিস্তলটি —যেটা তার অনেক সাধের ধন।

দেখা গেলো, তিন মাইল দূরে এক-কামরাবিশিষ্ট ইস্কুল ঘরে সে যা শিখেছে তার চেয়ে অনেক বেশি শিখেছে সেই খামারবাড়ির গোছানো বৈঠকখানায়। সেই বৈঠকখানায় মোটে তিনটে বই ছিলো—একটা বিরাট পুরনো পারিবারিক বাইবেল, একটা ঝুলানো পঞ্জিকা, একখন্ড মোটা 'জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার'।—নাহ, ওটা নতুন বিশ্বকোষ নয়। (The Compendium of Knowledge) তবে সংক্ষিপ্তসারটি ছিলো পুরনো কালের একটি "বিশ্বকোষ"। পাক-প্রণালী, বোনার নকশা, গেঁটে বাত, হাত-পা কাটার গৃহ-চিকিৎসা, এক রকম ফলের রস দিয়ে চুল কোঁকড়ানোর নিয়মাবলী ইত্যাদি টুকিটাকি খবরে ভর্তি ছিলো ওটা। তবে তখনকার জানা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির উপর লিখিত অনেক রচনাও তাতে ছিলো। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ বইটাতে যেনো ফ্রাঙ্কলিনের 'বিদ্যুতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা', রবার্ট ফুল্টনের নতুন 'বাষ্প জাহাজ' এবং 'বাষ্প' শকট নামের একটা বস্তু তৈরীর সর্বশেষ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনাও ছিলো। সে যুগে মানে, যখন বিশ্বকোষটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সেটি পুরোদস্তুর মহান কিছু।

কোন্ জিনিস ঠিক কিভাবে কাজ করে তা জানা, বোঝা এবং তা দেখার প্রতি স্যামের অত্যাধিক আগ্রহ ছিলো। তাই সে তার অবসর সময়ে বিশ্বকোষের সংক্ষিপ্তসারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো চষে বেড়াতে লাগলো। সে সাধারণতঃ তার সন্ধ্যার কাজ শেষে রান্নাঘরের চুল্লীর আলোয় বইটা নিয়ে পড়াশোনা করতো প্রতিরাতে। দিনের বেলায় তার বড়ো একটা অবসর মিলতো না। সকালবেলা ইস্কুলের দিকে দৌড়ে যাবার পূর্বেও তাকে জ্বালানী কাঠ কাটতে, গাই দোয়াতে ও গরুগুলোকে খাওয়ার পানি দিতে হতো। ইস্কুল থেকে ফেরার সাথে-সাথে আবার গাই দোয়ানোর সময় হয়ে পড়তো। তাছাড়া, তাকে বাড়ির চারদিকে বেড়া ঠিক করতে কিংবা চাষীর ইচ্ছানুযায়ী অন্য যে কোনো অনির্ধারিত কঠিন-কঠিন কাজও করতে হতো।

চাষী ভদ্রলোকের স্থির বিশ্বাস ছিল যে,—'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।' তাই তিনি স্যামের এই বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহকে উৎসাহ দিয়ে খুশি হতেন। তার কাজ-শেষে ভালো কোনো কিছুতে স্যাম ব্যস্ত থাকুক, তিনি তা দেখতে চাইতেন। তাই তিনি স্যামকে তাঁর কারখানায় প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে অনুমতি দিলেন। টুকটাক কাজ করার ব্যাপারে কারখানায় যন্ত্র বা জিনিসপত্রের অভাব ছিলো না। খামারের প্রায় সব জিনিসই তাকে নিজ হাতেই তৈরি করতে হতো। তখনকার দিনে যে কোনো চাষীকে একাধারে কাঠমিস্ত্রী, কর্মকার, মিলের মেরামতকারী, চর্মকার, এমন কি নিজ ব্যবহারের জন্যে বন্দুক প্রস্তুত এবং অন্যান্য অনেক কিছু করতে হতো।

এক সন্ধ্যায় সংক্ষিপ্তসার বিশ্বকোষটি পড়তে-পড়তে স্যাম একটা বিষয় আবিষ্কার করে ফেললো। বন্দুকের গুলীর পাউডারের প্যাকেট এর উপর লিখিত একটি বিশদ

নিবন্ধের খোঁজ পেলো সে। তখনই তার পিস্তলের কথাটা আবার স্মরণ হলো। দোতলায় তার বিছানার বালিশের নিচে ওটা এতোদিন রাখা ছিলো। তার মায়ের কাছে যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিলো, স্যাম তখনো পর্যন্ত তা রক্ষা করছিলো এবং সে পর্যন্ত বন্দুক ছোঁড়ার ব্যাপারে সে কখনো কোনো রকম চেষ্টা করেনি। কিন্তু বন্দুকের গুলীর পাউডারের উপর লেখা রচনাটি দেখার পরই সে মনে করে বসলো—হ্যাঁ, এবার আমি আর ছোটোটি নেই, এবার আমার অস্ত্র ব্যবহারের সময় হয়েছে। নিজে গুলীর পাউডার তৈরি করার মতো যদি তার বয়স হয়ে থাকে, তবে তার সদ্ব্যবহার করার মতো বয়সও তার হয়েছে। এটাকেই সে মনে করলো, —সে এখন বড়ো হয়েছে।

নিবন্ধ পাঠ করে তাতে বর্ণিত গন্ধক, কাঠ-কয়লা আর সোড়া দিয়ে গুলীর পাউডার তৈরি হয়। চাষী-বউ গন্ধক আর গুড় মিলিয়ে একরকম গরমকালীন টনিক তৈরির কাজে গন্ধক ব্যবহার করতেন। রান্নাঘর থেকে স্যাম তার কিছুটা চেয়ে নিলো। জঙ্গলে গিয়ে শুকনো গাছের ডাল পুড়িয়ে সে নিজেই কাঠ-কয়লা তৈরি করলো। রাস্তার ধারের মুদী দোকান থেকে কিছু সোড়া কেনার মতো পয়সা তার ছিলো। তারপর বিশ্বকোষ-এর সংক্ষিপ্তসারের ফর্মুলাটা মুখস্থ করে জঙ্গলে গিয়ে নিভৃতে বসে জিনিসগুলো মিশিয়ে ফেললো সে। ঠিক বইয়ের কথা মতো, একটা ঘর্ষণ লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই গুলীর পাউডার সশব্দে পুরো বনাঞ্চলটা বিদীর্ণ করলো।

এখন স্যাম তার ঘোড়া-পিস্তলটা ছোঁড়ার জন্য মনে মনে তৈরি হয়ে রইলো। এ পরীক্ষাকার্য তার মনিব চাষী ভদ্রলোক অনুমোদন করবেন কিনা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হতে পেরে স্যাম স্থির করলো যে, সে এক রোববার ছুটির দিনের বিকেলে চেষ্টা করবে পিস্তলটা ব্যবহারের। তখন তার কোনো কাজ থাকবে না এবং পাহাড়ের দূর আড়ালে যেতে তার অসুবিধেও হবে না। সেখানে দূর পাহাড়ে তাকে কেউ দেখতেও পাবে না, —কী হচ্ছে।

অবশেষে স্যামের বহু কাঙ্ক্ষিত রোববার এলো। ঘোড়া-পিস্তলটাকে তেল দিয়ে ঠিক করে রাখলো সে। গির্জায় সকালের প্রার্থনার সময় স্যাম ছট্‌ফট্ করতে লাগলো এবং রোববার দুপুরের খাবারটাও যেনো শেষ হতে চায় না। মনে-মনে সে অস্থির হয়ে পড়লো খুব।

চাষী-গিন্নি স্যামের এমন অস্থিরতা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন,—'বাবা, তোমার কি হয়েছে? আজ কি তোমার খিদেও লাগেনি? নাকি, তোমার শরীর খারাপ?' টেবিলের এপাশ থেকে একখন্ড মুরগীর রোস্ট তিনি স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। স্যাম বিনীতভাবেই বিড়-বিড় করে কি যেনো বলে তার খাওয়া খেতে শুরু করলো। মুখখানা এমন যেনো তেতো কিছু 'কুইনাইন ট্যাবলেট' গিলছে।

অবশেষে নিজের ইচ্ছে মতো বাড়ির বাইরে বেরুনোর সুযোগ ও অবসর পেলো সে। চুপিসারে সে দোতলায় তার রুমে ঢুকে সার্টের নিচে পিস্তলটা লুকিয়ে ফেললো।

তারপর বাড়ি থেকে পা টিপে-টিপে বের হয়ে পাহাড়ের দিকে চললো সে। এক সময় তার মনে হলো সে বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে। এবং তখনি সেখানে বসেই খানিকটা গুলীর পাউডার তৈরি করে পিস্তলে ভরতে শুরু করে দিলো খুব দ্রুততার সাথে।

প্রথমে স্যাম পিস্তলের নলে খানিকটা গুঁড়ো পাউডার ঢেলে দিলো। তারপর এক টুকরো চর্বি-মাখানো কাপড় দিয়ে মোড়া একটা 'পিস্তলবল' সে ঐ নলে গুঁড়ো পাউডার এর উপর ফেলে দিলো। বুড়ো আঙুল দিয়ে 'হ্যামারটা' পেছনের দিকে টেনে স্যাম তামার ছোটো প্রাইমার ক্যাপটি যায়গা মতো বসিয়ে দিলো। হ্যামারটা প্রাইমার ক্যাপটির উপর আঘাত করলে তাতে যে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হবে তাতে গুলীর পাউডারে আগুন ধরবে। স্যার ভাবলো,—এর ফলে যে বিস্ফোরণ হবে তাতে পিস্তলবল ছুটে বেরিয়ে যাবে সামনের দিকে।

দুরুদুরু হৃদয়ে হলেও পিস্তলটা তুলে নিয়ে হাত শক্ত করে সে এক চোখ বন্ধ করে দূরের একটা 'ওক্' গাছের ডালকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করলো। তারপর ঘোড়া টেনে গুলী ছুঁড়লো সে। এক প্রচন্ড গর্জনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তার কান ঝালাপালা করে ফেললো মুহূর্তে।

স্যাম এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো যে, একটা ঘোড়া-পিস্তলের আওয়াজ মাইলকে-মাইল দূরে থেকেও শুনতে পাওয়া যায়, সে কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো। সে এটাও ভুলে গিয়েছিলো যে, চাষী ভদ্রলোক গোঁড়া ধর্মান্ধ বা পিউরিটান। রোববারে—হাসি, চিৎকার, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি কিংবা কোনো অসঙ্গত আচরণ তাঁর ভীষণ অপছন্দ। বন্দুকের গুলীর কথা তো মোটে উঠতেই পারে না। কিন্তু এখন আরতো কোনো উপায় নেই। স্যাম এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে সার্টের একটা কোণ টেনে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। তারপর ওটা দিয়ে পিস্তলটা সে ঢেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা মরা ওক্ গাছের গর্তে ওটাকে লুকিয়ে রাখলো। তারপর দৌড়ে খামারবাড়ির দিকে ছুটলো।

এর মিনিট কয়েক পরে স্যামের খোঁজে চাষী ভদ্রলোক বৈঠকখানায় এলেন। তিনি জানতে চাইছিলেন, ছেলেটি বিকট একটা বজ্র-ধ্বনি শুনেছে কিনা। আকাশে কোনো মেঘ ছিলো না; দিনটা কতো সুন্দর মনে হয়েছিলো চাষীর কাছে, কিন্তু এ শব্দ কিসের আলামত? বাড়িতে বৈঠকখানায় জানালার ধারে চুপ করে বসেছিলো স্যাম—হাতে তার পবিত্র বাইবেল। ভীষণ রকম মশ্‌গুল সে বাইবেলে আর মুখে অনুতাপের চিহ্ন। পবিত্র গ্রন্থের প্রতি পবিত্র এই দিনে ছেলেটির এমন ধ্যানমগ্ন অনুরাগে মুগ্ধ হয়ে চাষী কোনো কথা না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নিঃশব্দে।

খামারে তার কাজের মেয়াদকাল শেষ করে বাড়ি যাবার সময় না হওয়া পর্যন্ত স্যাম ওক্ গাছের গর্ত থেকে পিস্তলটা বের করতে সাহস করেনি আর। এ সময়ের

মধ্যে সরল, সৎ ছেলেটির উপর চাষী দম্পতির মায়া ধরে গেছে এবং তাকে মেয়াদ শেষে বিদায় নিতে দেখে তাঁরা খুবই মর্মাহত হলেন। তাঁদের হারানোর ব্যথা বালক স্যামের মনকেও ছুঁয়ে গেলো। তাই সে বাড়ি ফেরার সময় আবার বেড়াতে আসবে বলে কথা দিয়েছিলো খামার মালিককে। ওদিকে তার পিতার রেশমের মিল দেখার জন্যে সে আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিলো। এর আগে সে কোনো উৎপাদনের কারখানা দেখেনি। আর আজ নিজেদের মিলেই নাড়াচাড়া করার মতো নানান জাতের কতো রকম যন্ত্রপাতি থাকবে, ভাবতেই তাঁর আনন্দ হলো প্রচুর।

অবশ্য বালক স্যামের হতাশ হবার কোনো কারণ ছিলো না। মিলটা যেনো যন্ত্রপাতির যাদুঘর—স্বর্গরাজ্য। ঘূর্ণায়মান তাঁত আর মাকুর ঠক্‌ঠকিতে মিলটা সরগরম। তাতে খুঁচরো নানা মেরামত ও যান্ত্রিক রদবদল লেগেই আছে। স্যাম তো সাহায্যের জন্য এক পা এগিয়েই আছে মনে-প্রাণে। শুধু বাবাকে বলতেই যা ভয়। অনেক সময় মনে হতো, কোনো একটা যন্ত্র নষ্ট হবার অপেক্ষায়ই যেনো স্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু এতো সব কিছুর পরেও স্যামের মনের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলো,—মিলের ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরী। ওখানটায় রেশম ব্লীচ্‌ করে রঙ দেয়া হতো। ল্যাবরেটরীটা রাসায়নিক দ্রব্যে ভর্তি ছিলো আর ছিলো সাধারণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। স্যামের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্যে যা কিছুর প্রয়োজন ঠিক যেনো তাই-তাই ওখানটায় ছিলো। এই ল্যাবরেটরীর ভারপ্রাপ্ত রসায়নবিদ ছিলেন এক যুবক—তাঁর নাম উইলিয়াম স্মিথ। স্যামকে তিনি ভীষণ পছন্দ করলেন। তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় তিনি স্যামকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তবে, স্যাম খুব বেশি রকম উৎসাহী হয়ে গোটা কারখানাটাই না আবার উড়িয়ে দেয়—এসব ভেবে রসায়নবিদকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়েছিলো। তখনো স্যামুয়েল তার নিজের গুলীর পাউডার তৈরি করছিলো। একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর বিস্ফোরণের চেয়ে অন্য আর কিছু সে পছন্দ করতো বলে মনে হয় না।

চিরকাল কারখানায় থাকতে পারলে স্যাম খুশি হতো। তার বাবার কিন্তু অন্য রকম ইচ্ছে ছিলো। ক্রিস্টোফারের ব্যবসায়ে সুদিন দেখা দিতে শুরু করেছে। তাই স্যামের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখা দিলো। ১৪ বছর বয়সে তাকে নিকটবর্তী আমহার্স্ট শহরের এক একাডেমীতে ভর্তি করে দেয়া হলো। কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, স্যাম সাথে করে কিছু-কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে নিলো। তা দিয়ে সে একাডেমীতে থাকার ছোটো কামরায় একটা ক্ষুদে ল্যাবরেটরী তৈরি করে ফেললো। নিজের তৈরি আতশবাতি সহপাঠিদের মাঝে বিলিয়ে অচিরেই সে তাদের স্বীকৃতি পেয়ে গেলো।

এসব পরীক্ষা চালানোর ফলে যে হট্টগোল ও আওয়াজ সৃষ্টি হলো তাতে সে তার একাডেমীর শিক্ষকদের কাছে বিরাগভাজন হলো।

একাডেমীতে স্যামের তখনো খুব বেশিদিন হয়নি। এরই মধ্যে সে তার প্রথম মৌলিক আবিষ্কারের চিন্তা স্থির করে ফেললো। বাবার কারখানায় ফিরে গিয়ে সে 'বৈদ্যুতিক ব্যাটারি' তৈরি করা শিখে ফেলেছে। পরে সে বুঝতে পারলো যে,—বিদ্যুৎ দিয়ে গুলীর পাউডারে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। এ বিষয়ে সে কিছুদিন ধরেই চিন্তা করছিলো। তার ধারণা হলো, —তার এই আবিষ্কার কোনো ভালো কাজে প্রয়োগ করার নিশ্চয়ই ভিন্ন পথ আছে, এবং সে পথ তাকেই খুঁজে বের করতে হবে।

দিনেদিনে ধীরে-ধীরে তার মাথায় একটা নতুন ধারণার সৃষ্টি হলো। সারা জীবন ধরে সে ১৮১২ সালের যুদ্ধের গল্প শুনে এসেছে। বিশেষতঃ যে সব বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ এ্যামেরিকার উপকূল ভাগ আক্রমণ করেছে তাদের সমস্ত কথা সে শুনেছে। 'ফ্রান্সিস স্কট কী'র' 'তারকা-খচিত পতাকায়' বর্ণিত 'বল্টিমোরের ফোর্ট ম্যাকহেনরী'র উপর কামানের গোলাবর্ষণ স্যামের জন্মের মাস খানিকের মধ্যকার এক আলোচিত ও আলোড়িত ঘটনা। জানা যায়,—যদি সব শত্রু জাহাজকে পানি থেকে উড়িয়ে দেবার কোনো উপায় থাকতো, তাহলে হয়তো এ্যামেরিকা আরো আগে যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হতো। স্যাম চিন্তা করলো,— 'বিদ্যুতের সঙ্গে গুলীর পাউডার!' ওখানেই উত্তর লুকিয়ে রয়েছে। আমাকে দেখতে হবে আরো, জানতেও হবে আরো।

কিন্তু এই ধারণাকে পরীক্ষা করার জন্যে তাকে একাডেমীর ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। সেই গ্রীষ্মে 'ওয়েআর'-এ অবস্থিত রেশমের কারখানায় ফিরে সে গ্রামের মাঠে বিরাট দুটি খুঁটির সাথে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলো। তাতে লেখা ছিলোঃ —.

'স্যামুয়েল কোল্ট'
আগামী ৪ঠা জুলাই, ১৮২৯ ওয়েআরের
পুকুরে একটা নৌকোকে শূন্যে উড়িয়ে দেবে

সাইনবোর্ডের অভিনব ঘোষণা শহরে একটা বড়ো আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো— "গুলীর পাউডার শুকনো রাখো", —এ উপদেশ সবারই জানা কথা। ভেজা পাউডারের বিস্ফোরণ হতে পারে না! যদি হয়ও, তাহলেও পানির নিচে কেমন করে তাতে অগ্নি-সংযোগ করা হবে? তরুণ আবিষ্কারক এমন কি আশ্চর্য খেলা দেখাবে, তা দেখার জন্যে শহরের প্রায় অধিকাংশ বাসিন্দা ৪ঠা জুলাই তারিখে এসে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হলো।

স্যাম দর্শকবৃন্দের জন্য তৈরি হয়েই ছিলো। আগের রাতে সে একটা ওয়াটার প্রুফ পাত্রে খুব শক্তিশালী গুলীর পাউডার ভরে পুকুরের তলদেশে রেখে দিলো। পারের জঙ্গলে সে লুকিয়ে রেখেছিলো একটা বিদ্যুতায়িত ব্যাটারী। বিটুমিন বা পিচ দিয়ে কালো করা তার দিয়ে সে পানির নিচের পাউডার পাত্রেও ব্যাটারি সংযুক্ত করে দিলো, কারণ তারের উপর কোনো পানি ভেদী প্রলেপ না দিলে আর্থিং হয়ে যাবে। সমবেত লোক পুকুরের

মাঝখানে একটা নৌকো ভাসতে দেখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে বা বুঝতে পারলো না। জঙ্গলের মধ্যে স্যাম তার ব্যাটারি ঠিকঠাক করছিলো বসে-বসে।

সব কিছু ঠিকমতো করা হয়েছে, ভেবেচিন্তে স্যাম এ ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত হলো। কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই তার ভুল হয়ে গিয়েছিলো। নৌকোটা বেঁধে রাখতে ভুলে গিয়েছিলো সে। শহরের সবাই ভীষণ কৌতুহল এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ জোর বাতাস এলো। তার ফলে পাউডার পাত্রের উপর থেকে নৌকোটা সরে গেলো। স্যাম তা লক্ষ্য করেনি। নিশ্চিত বিশ্বাসে সে ব্যাটারিতে নেগেটিভ+পজেটিভ সংযোগ দিলো। পানির নিচে একটা ভক্ ভক্ আওয়াজের বিস্ফোরণ ঘটলো। কাদামাটি আর পানি শূন্যে উত্থিত হলো। বেশীর ভাগ দর্শকেরা ছুটির দিনের ভালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়েছিলো। হতভম্ব দর্শকদের সেই উত্থিত কাদামাটি আর পানি ভিজিয়ে একাকার করে ফেললো। নৌকোটা তখন বিস্ফোরণ স্থল থেকে অনেকটা নিরাপদ দূরত্বে। তাই ওটা তখন ঢেউয়ের দোলায় শুধুই দুলতে শুরু করেছিলো। যা হওয়ার কথা, তা হলো না।

কিন্তু খুশি মনে স্যাম জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো। তার ধারণা ছিলো, দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে হাততালি পাবার—কিন্তু তার কপালে জুটলো,—চিৎকার, তিরস্কার আর হুমকি। কে একজন চিৎকার করে বলে উঠলো,— 'এই ইঁচড়েপাকা ছেলে—তোমাকে এখন আচ্ছা চুবুনি দেয়া দরকার এই কর্দমাক্ত পুকুরে।'

৪ঠা জুলাই-এর উত্তেজনা অব্যাহত রাখার জন্য মাথা-গরম এক দল লোক স্যামের চারপাশে ভিড় করে তাকে পানির দিকে ঠেলতে শুরু করে দিলো। স্যাম চিৎকার করে বলে উঠলো,— 'বিস্ফোরণ হয়েছে—এটা সত্যি কিনা? পানির নিচে এমনি বিস্ফোরণ এর আগে আপনারা কখনো দেখেছেন, বলুন দেখেছেন?'

জনতার মধ্য থেকেই একটা উচ্চকণ্ঠ ঠিক সময় মতো এগিয়ে এলো এবং তাকে রক্ষা করলো, —'ছেলেটি ঠিকই বলছে! ঠিক তার দেয়া কথা মতো বিস্ফোরণ হয়েছে। নৌকোটা বাতাসে সরে গেছে সেটা স্যামের অপরাধ নয়। যদি ওটা সরে না যেতো, তাহলে ওটা ফেটে চৌচির হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়তো। এবার সবাই বুঝতে পেরেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমার মতে, স্যামের আবিষ্কার খুবই সার্থক হয়েছে।'

দর্শকবৃন্দ এবার তা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। কাদা লাগার জন্যে স্যাম ক্ষমা চাইলো বিনীতভাবে। পানিতে চুবুনি দেওয়ার পরিবর্তে এবার দর্শকদের সবাই তাকে অভিনন্দন জানালো। —'পানির নিচে বিস্ফোরণ!' এটা সে কি কিভাবে ঘটালো সবাই তা জানতে চাইলো। —কিন্তু ভবিষ্যত বিজ্ঞানী, গবেষণার নিরাপত্তার কথা ভেবে তা প্রকাশ করতে রাজী হলো না।

সেই শরতে ছুটির কাটিয়ে—ইস্কুলে ফিরে তার সহপাঠীদের উপকারার্থ সে তার পানির নিচের বিস্ফোরণের প্রদর্শনী করলো। প্রধান শিক্ষক রেভারেন্ড রয়েল ওয়াশবার্ন

ভাবলেন,—পানির নিচের বিস্ফোরণ আর হাতে তৈরী আতশ-বাজি—এটা কিছুটা বাড়াবাড়ি মনে হলো তাঁর। তাই তিনি ইস্কুলের সম্পত্তি বা কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যাপারে তাকে সাবধান করে দিলেন।

শিক্ষক রেভারেন্ড বললেন,—'স্যামুয়েল, তোমার লেখাপড়ায় মন দেয়া উচিত। বিস্ফোরণ সম্পর্কে হয়তো তুমি পারদর্শী হতে পারো; কিন্তু ভালো ছাত্র হিসেবে গৌরব করার মতো পৃথিবীতে কিছুই নেই।'

কথাটা সত্যি এবং স্যামকে তা স্বীকার করতে হলো। তার পাঠ্য ল্যাটিন ভাষা, ছন্দ-প্রকরণ, নৈতিক দর্শন ও বক্তৃতা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। সৌভাগ্যবশতঃ একাডেমিতে বিজ্ঞানের এক কোর্স ছিলো। তাতেই তার খারাপ ফলের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হতো। অঙ্ক এবং নৌ-বিদ্যাতে সে ভালো ফল করতো। এ দুটো বিষয় সাগরযাত্রীর দেশ নিউ ইংলন্ডের সব ইস্কুলেই পড়ানো হতো বাধ্যতামূলকভাবে। বস্তুতঃপক্ষে, সমুদ্রে যাবার আকাঙ্ক্ষা তার মনে ধীরে-ধীরে দানা বাঁধছিলো। ওটা তার কাছে উত্তেজনাপূর্ণ রোমাঞ্চিত এ্যাডভেঞ্চারাস জীবনরূপে ধরা দিয়েছিলো। এদিকে 'আমহার্স্টে' সত্যি বলতে কি, তার আর ভালো লাগছিলো না। একবার সে তার বাবার কাছে লেখা এক চিঠিতে কথাটা লিখেছিলো। কিন্তু বাবা ক্রিস্টোফার স্যামকে ইস্কুল থেকে তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অবশ্যই শেষ করতে হবে বলে কড়াকড়ি শর্ত এবং চাপ দিয়ে চিঠির উত্তর দিলেন।

এতো সব করেও কিন্তু আজকের এই মহান বিজ্ঞানীর শিক্ষা সমাপ্ত করার সুযোগ হয়নি। তার শিক্ষা-জীবন অকস্মাৎ এক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এক সন্ধ্যায় স্যাম তার ল্যাবরেটরির রুমে কাজ করার সময় সামান্য ভুল করে ফেলে। ফলে হলো কী,—ইটের তৈরী দোতলা ইস্কুল-দালানটা এক ক্ষুব্ধ গর্জনে কেঁপে উঠলো। শিক্ষক-ছাত্র সবাই স্যামের কোঠায় দৌড়ে এসে দেখতে পেলো, সে বিছানার উপর হতভম্ব হয়ে বসে আছে আর সমস্ত শরীরের রক্ত যেনো তার মুখে এসে জমা হয়েছে। সে চোট পায়নি, কিন্তু কামরাটার অবস্থা শোচনীয়। প্রধান শিক্ষক রেভারেন্ড ওয়াশবার্ন স্যামের যন্ত্রপাতির পুড়ে যাওয়া অংশসহ সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করলেন। কিছু সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত ইস্কুলের পরিচালনা পরিষদ এবং বোর্ডকমিটি পরের দিন মিলিত হয়ে তার বিষয়ে কোনো উপযুক্ত কিছু সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত স্যামের রুমের বাইরে যাওয়া বন্ধ করেও নির্দেশ জারী করেছিলেন।

কিন্তু সবাইকে হতবাক করে দিয়ে বোর্ড-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ স্যাম তাঁদের দেয়নি। সেদিনই গভীর রাত্রে তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে ওয়ে-আর-এর দিকে রওয়ানা দিলো। পরদিন ভোরে তার পলায়নের খবর জানাজানি হলে ফ্যাকালটির প্রায় সকল সদস্যই বলতে গেলে এক কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। স্যামের উদ্দেশ্য ছিলো মহৎ। তুখোড় ছেলে সে। কিন্তু সে সব সময় বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে

ঘাঁটাঘাঁটি করতো। তাই তার সঙ্গে একই দালানে বাস করার অর্থ,— 'একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সাথে এক বিছানায় বাস করা!'

অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ি পৌঁছাবার পর স্যামকে তার বাবার ক্রুদ্ধ তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হলো। বাবা ক্রিস্টোফার কোল্ট গর্জে উঠলেন,— 'এ দেখার জন্যেই কি আমার এতো ত্যাগ স্বীকার, বেঁচে থাকার আকাঙ্খা? লেখাপড়া সব বাদ দিয়ে নিজেই-নিজের হস্টেল-রুমের কোঠা উড়িয়ে দিচ্ছো, কেমন? এজন্যে নিশ্চয় তোমাকে এতো খরচপাতি করে দূরের আবাসিক একাডেমীতে পাঠানো হয়নি! বলো? উত্তর দাও?'

স্যাম খুব নম্র ও বিনীতভাবে বললো,—'আমি যেসব বিষয় ভালোবাসি তা তাঁরা ইস্কুলে পড়ান না। আর এখন তাঁরা আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে নিয়েছেন। যদি আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করতেই না পারলাম, তবে আমি আর ওখানে থাকতেও চাইনা। তাছাড়া,—আপনি বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট করে শুধু আমার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করবেন, এটাও আমি চাইনা বাবা। আমার নিজের পথ বেছে নেবার মতো বয়স এখন নিশ্চয় আমার হয়েছে?'

ক্রিস্টোফার তার ছেলেকে সাময়িকভাবে আবার রেশম কারখানায় ফিরে যেতে আদেশ করলেন। স্যামের মেধা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। তবে তাঁর স্থির বিশ্বাস,—এখন তার বড়ো প্রয়োজন কঠিন নিয়মশৃঙ্খলার বন্ধন। হয়তো স্যামের সাগরে যাবার মানে, নাবিক হবার ইচ্ছে, এটাও মন্দ নয়। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় সে হয়তো মানুষের মতো মানুষ হয়ে ফিরে আসতে পারে।

এর মাত্র কয়েকদিন পর ক্রিস্টোফার তাঁর বন্ধু 'বোস্টন'-এর এক শিপিং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী স্যামুয়েল লরেন্সের কাছে একটি চিঠি দিলেন। অফিসারের কাজে শিক্ষানবিশি হিসেবে স্যামকে 'মিড-শিপ্‌ম্যান' করে নেয়া যায় কি না, তা জানতে চাইলেন তিনি বন্ধুর কাছে।

লরেন্সের উত্তরও খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া গেলো।

তিনি বন্ধুর চিঠির উত্তরে লিখলেন,—

প্রিয় বন্ধু ক্রিস্টোফার,

অনেকদিন পর তোমার চিঠি আমাকে ভীষণ আনন্দ দিয়েছে। তুমি যে এখনো আমার মতো বন্ধুটিকে স্মরণে রেখেছো এতে করে তোমার মনের হৃদ্যতার এবং মানবিক উদারতার প্রকাশ মিলে। বন্ধু, তুমি আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা নিও এবং ঈশ্বরের দৃষ্টি তোমার এবং স্যাম-এর প্রতি বর্ষিত হোক এটাই কামনা করি।

এবার তোমার চিঠির উত্তরে বলছি,— আগামী সামারে দুই মাস্তুলের একটি বাণিজ্য জাহাজ নাম 'কার্ভো' সেটি বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করবে। জাহাজটি পুরো একটি বছরের

জন্য বোস্টন পোতাশ্রয় ত্যাগ করবে, পথে লন্ডন-এর ডান্ডি হয়ে ভারতের কোলকাতা বন্দরে গিয়ে যাত্রা শেষ করবে—ফের যাত্রা আবার একই পথে যথারীতি মূল বন্দর বোস্টনে।

তোমার ছেলে স্যাম—সেতো আমারও ছেলের মতো। ওর জন্যে এই 'কার্ভো' জাহাজেই আমি চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।

আর সত্যি কথা বলতে নাবিক-এর শেকড় এই দেশ নিউ ইংল্যান্ডের কোনো বালকের ভবিষ্যত সৌভাগ্য গড়ার শুরুতে এটা এক রোমাঞ্চিত, বিরাট এবং চমৎকার সুযোগ।

আশা করি স্যাম-এর মতামত নিয়ে যদি তোমরা রাজি থাকো তবে অবশ্যই স্যামকে ১৮৩০-এর জুলাই মাসের মধ্যে বোস্টনে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

তোমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের প্রতি আমার থেকে করজোড় আবেদন ও আমার ঐকান্তিক শুভেচ্ছা—

তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

—স্যামুয়েল লরেন্স

বোস্টন। ১৮৩০

১৮৩০ সালের ২রা আগষ্ট, স্যামের ষোড়শতম জন্মদিনের দু'সপ্তাহ পর কার্ভো জাহাজ বোস্টন বন্দর ত্যাগ করে লন্ডন হয়ে কোলকাতার পথে প্রথম পালটি তুলে রওয়ানা হলো। তার খোলের ভিতর ইয়াংকি তুলো আর ডেকের উপর একদঙ্গল মিশনারীর ব্যস্ত চলাফেরা। নাবিকের প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম স্যামকে দেয়া হয়েছে। তার পরনে ছিলো তারপুলিনের তৈরী ডোরাকাটা সার্ট এবং ঠিক একই কাপড়ের ডোরাকাটা পাজামা। তার বাক্স ভর্তি দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র, কম্পাস আর পঞ্জিকা, আর পকেটে রয়েছে নতুন চক্‌চকে এক ডলার দামের একটা বড় চাকু।

কার্ভো জাহাজ রওয়ানা হবার ঠিক পূর্বে, সম্মুখভাগের উপরের পালটা খুলে দেবার জন্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন স্যামকে মাস্তুলের উপর ওঠার আদেশ দিলেন। তার হাতের উপর দিয়ে ভারি দড়িগুলো গড়িয়ে যাবার সময় স্যাম চেয়ে দেখলো,—পালগুলোতে হাওয়া লেগে ফুলে-ফেঁপে টানটান হয়ে পড়েছে। জাহাজ চলতে শুরু করলো। সে বুঝতে পারলো, আবার নিউ ইংলন্ডের দেখা পেতে তাকে দীর্ঘদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এখন শুধুই পানির সাথে মিতালী।

এ সমুদ্রযাত্রা স্যামের খুবই পছন্দ হলো, এতো তারই কাঙ্ক্ষিত। সে কল্পনার চোখে নাবিক জীবনের কতো রঙিন অভিযানের স্বপ্ন দেখতো আর নিজে সেই জীবনকে স্বপ্নভরা চোখে কল্পনা করতো। কিন্তু যাত্রার মাত্র ক'দিন পর পরই সপ্তাহ ধরে সাগর ও আকাশ ছাড়া সে আর কিছুই দেখেনি। মন থেকে এই হতাশা তাড়ানোর জন্যে সে স্বেচ্ছায় জাহাজের উপর বিরক্তিকর গতানুগতিক কাজকর্মে ক্রমেই বেশি চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কার্গো জাহাজের ডেকে'র চেয়ে বিল স্মিথের রাসায়নিক ল্যাবরেটরীর ছোটো ঘরটা তার কাছে বেশি রোমাঞ্চকর মনে হতে লাগলো।

মাঝে-মাঝে কোনো ঘুমন্ত বন্দরে জাহাজ কর্মীদের খাদ্য-সামগ্রীর জন্যে সামান্য বিরতি একঘেয়েমির হাত থেকে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও রক্ষা করতো। কখনো-কখনো গ্রীষ্মমন্ডলের ঝড় কয়েক ঘন্টার জন্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করতো। তখন জাহাজের প্রতিটি সমর্থ মানুষ তার সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছতো। তবে স্বভাবত সাগরগুলো ছিল শান্ত। কার্গো জাহাজের বিটুমিন দেয়া ডেকে'র উপর প্রথম সূর্যের আলো হুমড়ি দিয়ে পড়তো। সে সময় জাহাজটা দক্ষিণ মুখে উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে এগিয়ে চলছিলো। এরপর জাহাজটা ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর পার হয়ে অবশেষে কোলকাতা বন্দরে গিয়ে পৌঁছবে।

খালাসীদের প্রায় সবাই অবসর সময়ে ডেক-এর উপর একত্রে বসে গল্প করতো আর চাকু দিয়ে কাঠ কেটে নানান রকমের কাঠের সুন্দর-সুন্দর খেলনার জিনিস তৈরি করতো। অন্য তেমন আর কিছু করার ছিলোও না। ব্যস্ত থাকার একটা উপায় খুঁজে পেয়ে স্যামও খুশি হলো। বোস্টন ত্যাগের চার মাস পর কার্গো জাহাজ কোলকাতা পৌঁছার সময়ে পুরোনো খালাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী যারা তাদের চাইতে সুন্দর, কখনো প্রায় সমপর্যায়ের কাঠ খোদাই-এর কাজে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলো স্যাম।

কোলকাতার বন্দরে জাহাজ এসে যখন নোঙর করলো সঙ্গে-সঙ্গে তাদের একঘেয়েমির অবসান হলো। নিউ ইংলন্ড থেকে প্রথম সফরে আসা এক সরল যুবকের জন্যে শহরটার চোখ-ধাঁধানো চটক আর অপরিচ্ছন্নতার মধ্যেকার পার্থক্য প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো। তবে কোলকাতার সব দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে যেটা স্যামের মনকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছিলো তা হলো তারই দেশী ভাই এক এ্যামেরিকানের হাতের তৈরি কিছু জিনিস। সেটা হলো কলকাতার বন্দুকের দোকানে জানালায় রক্ষিত পুনঃপুন ক্রিয়াশীল পিস্তল। সেটা এলিশা কোলিয়েরের আবিষ্কার এবং এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিলো যে, একবারে ছ'টা গুলী ভরে পর-পর ছ'বার গুলী করা যেতো।

স্যামের বড়োভাইয়ের থেকে কেনা সেই পুরোনো ঘোড়া-পিস্তলের মতোই কোলিয়েরের বন্দুকটারও চকমকি পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বলতো। কিন্তু মামুলি চকমকি অস্ত্রের মতো এটার নলের মধ্য দিয়ে বারুদ ভরা হতো না। পিস্তলটার নলের ঠিক পিছনেই বসানো ছিলো একটা ছ'ছিদ্র বিশিষ্ট গোলাকার ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডার। এই ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারে ছিলো ভিন্ন-ভিন্ন পর্যায়ক্রমিক ছয়টি বারুদ-কোঠা। ব্যবহারের পূর্বে প্রতিটি কোঠা ভিন্ন-ভিন্নভাবে বারুদ ভর্তি গুলী দিয়ে পূর্ণ করতে হতো। জীবন রক্ষার জন্য যাদের ঘন-ঘন গুলী ভরতে হয়, তাদের জন্যে এই অস্ত্রটা খুবই অসুবিধাজনক ছিলো।

তাছাড়া আরো বেশ কিছু ত্রুটি, ঝামেলা ও অসুবিধা ছিলো। ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারটি ছিলো বড়ো ও অসুবিধাজনক। প্রতিবার গুলী ছুঁড়বার পর ওটাকে হাতে ঘুরিয়ে নিতে

হতো—তার অর্থ, প্রকৃতপক্ষে এই পিস্তলটিও স্বয়ংক্রিয় ছিলো না। এবং ওটায় এতো বেশি জটিল যন্ত্রাংশ ছিলো যে, সব সময়ই কোনোটা-না-কোনোটা বিকল হয়ে যেতো। কোনো-কোনো সময় সিলিন্ডারের অন্যান্য কোঠায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়তো। তার মানে, কখনো এ রকম ঘটলে সবগুলো কোঠা এক সঙ্গে ফেটে কেবল পিস্তলটি নষ্ট হতো না, তার চালক কিংবা মালিকের জীবন নিয়েও হয়তো টানাটানি শুরু হয়ে যেতো।

এসব নানান রকম অসুবিধা ছাড়াও, কোলিয়েরের পিস্তল এখন একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। খোলা বারুদের প্রয়োজন হয় বলে চকমকি অস্ত্রগুলো খুব দ্রুত অচল এবং জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলো। আর এই রকম পিস্তলের জায়গা দখল করছিলো এমন সব বন্দুক যেগুলোতে সদ্য আবিস্কৃত 'পার্কাশান ক্যাপ' ব্যবহার করা হতো। বন্দুকের হ্যামারের (হাতুড়ির) আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে এসব ক্যাপ বিদীর্ণ হতো লক্ষ্যবস্তুর প্রতি।

স্যাম, কোলিয়েরের বুদ্ধির প্রশংসা করলো সত্যি; তবে সে বুঝতে পারলো,—নতুন 'পার্কাশান ক্যাপে'র উপযোগী করে একটা কার্যক্ষম সত্যিকারের পুনঃপুন ক্রিয়াশীর অস্ত্র তৈরি করতে হবে। তার বিশ্বাস ছিলো, একটা কার্যক্ষম পুনঃপুন ক্রিয়াশীল পিস্তল হাতে যে কোনো লোক প্রচলিত বন্দুকধারী অনেক লোককে একা হারিয়ে দিতে পারবে। স্যাম অবাক হয়ে আরো ভাবলো, আজ পর্যন্ত এমন কোনো বিজ্ঞানী তেমনি একটা পিস্তল আবিষ্কার করেননি?

কার্ভো জাহাজ কোলকাতা বন্দর ছেড়ে যাবার পথে স্যাম, কোলিয়েরের পিস্তলের নকশাটা আঁকলো নিজে। পার্কাশান ক্যাপের উপযোগী করে কোলিয়েরের ঘোরাবার প্রণালীটাকে কাজে লাগাবার কোনো নতুন পন্থা বের করা যায় কিনা, সেজন্যে স্যাম ঐ নকশাটা অনেকদিন ধরে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলো। এক সময় কার্ভো জাহাজ উষ্ণ ও আর্দ্র বঙ্গোপসাগর পার হলো। জাহাজের গতির সাথে তাল মিলিয়ে এবার স্যাম নিজের বুদ্ধি মতো নতুন-নতুন নকশা আঁকতে শুরু করলো। ভারত মহাসাগরে গিয়ে জাহাজ পড়ার আগে ও পরে যা কিছু সময় পাওয়া গেলো সেই সময়ের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ নতুন একটা পুনঃপুন ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের নকশা তৈরি করে ফেললো। তার বিশ্বাস, এতে পার্কাশান ক্যাপ ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু এতো কিছু করার পরেও তার সামনে একটা বিরাট সমস্যা রয়ে গেলো। একটা সত্যিকার স্বয়ংক্রিয় রিভলভার তৈরি করাই তার ইচ্ছে। সে এমন একটা উপায় উদ্ভাবন করতে চাইলো যাতে প্রতিবার গুলী করার সঙ্গে-সঙ্গে আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলিন্ডার ঘুরে যায় এবং পরবর্তী গুলী করার জন্যে সেটাকে জায়গা মতো ঠিকভাবে আটকে রাখতে সক্ষম হয়।

একদিন বিকেলবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে স্যাম তার কাঙ্খিত সূত্রটা পেয়ে গেলো। স্যাম ডেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খালাসীদের জাহাজের চাকা ঘোরানোর কাজ দেখছিলো। যেভাবেই চাকা ঘোরানো হলো না কোনো একটা 'স্পোক' সব সময়েই স্থির ক্লাচের

লাইনে এসে স্থির হয়ে যেতো। এই ক্লাচটি স্পোককে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে চাকাটাকে নিজ জায়গায় আটকে দিতো। স্যাম জাহাজের চাকার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে। সে বুঝতে পারলো, এটা তার পিস্তলের ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারেরই অনুরূপ। চাকার স্পোকগুলো সিলিন্ডারের মধ্যেকার গুলীর কোঠাগুলোর মতোই। পার্থক্য শুধু কাঠামোয়।

প্রতিবার জাহাজের চাকা ঘোরার সঙ্গে-সঙ্গে একটা স্পোক স্থির ক্লাচের একই লাইনে এসে পড়তো এবং সেই ক্লাচ চাকাটাকেও ঠিক-ঠিক মতো আটকে রাখতো। প্রতিবার পিস্তলের সিলিন্ডার ঘোরার সঙ্গে-সঙ্গে একটা গুলির কোঠা পিস্তলের স্থির নলের একই লাইনে এসে পড়বে এবং নলটা সিলিন্ডারকে ঠিক মতো আটকে রাখায় ব্যাপারে ক্লাচের মতো কাজ করবে। এই ধারণায় নিজের মনকেও স্যাম স্থির করলো। স্যাম এই ধরনের পিস্তলই আবিষ্কার করতে চাইছিলো।

এই সূত্র ধরে স্যাম সঙ্গে-সঙ্গে আবার নতুন নকশা আঁকতে শুরু করে দিলো। এবার সে বুঝতে পেরেছে, কিভাবে সিলিন্ডারকে পুনরায় জায়গামতো ঠিক-ঠিক আটকে রাখা যায়। কিন্তু কিভাবে ওটাকে আপনা থেকেই ঘোরানো যাবে না সে তখন পর্যন্ত বুঝতে চেষ্টা করেও বুঝতে পারলো না। অবশেষে সে ভাবলো—পিস্তলের ঘোড়া টানার পূর্বে হ্যামারটাকে পিছনে টানার সহজ পন্থা দ্বারা একই সঙ্গে সিলিন্ডারকে ঘুরিয়ে জায়গা মতো আটকে রাখা যেতে পারে। গুলী করার পর পিস্তলের হ্যামার পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সিলিন্ডারটা ঘোরানোর জন্যে খুলে যাবে। তারপর আবার হ্যামার টেনে সিলিন্ডার ঘুরিয়ে নলের সঙ্গে পরবর্তী কোঠাটা একই লাইনে এসে যাবে। বলা যায়, তার এই ধারণাটা যদি কার্যকরী করে প্রস্তুত করা যায়, তাহলে পিস্তলটাকে উপর্যুপরি কয়েকবার দ্রুত ব্যবহার করা যাবে।

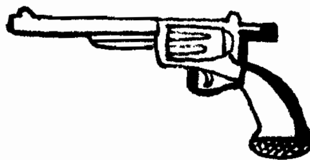
কার্ভো জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আফ্রিকার মূল ঘেঁষে উত্তরমুখী হয়ে লন্ডনের পথে রওয়ানা হলো। স্যাম তার পকেট-ছুরিটা দিয়ে একখন্ড কাঠ নিয়ে তার রিভলবারের একটা মডেল তৈরির কাজ শুরু করে দিলো। তার আবিষ্কার যাতে জাহাজের কেউ দেখতে না পারে, সেজন্যে সে তার পকেটে কার্ভো জাহাজের একটা অর্ধ সমাপ্ত হাতে তৈরি কাঠের মডেল রেখে দিতো। কেউ কাছে গিয়ে আসছে দেখলেই সে ওটা পকেট থেকে বের করে নিতো। রাত্রে শোয়ার আগে স্যাম তার বন্দুকের মডেলটা তার বাক্সে কাপড়ে মুড়িয়ে লুকিয়ে রাখতো।

কার্ভো জাহাজ ইংলন্ডে বেশীদিন থাকেনি। আবার আটলান্টিক পার হয়ে এক বছর পর জাহাজটা বোস্টন বন্দরে নোঙর করলো। স্যামের পিতা তার অপেক্ষায় জাহাজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্যামকে তিনি প্রায় চিনতেই পারলেন না। সে আরো বড়ো, আরো রুক্ষ চেহারার হয়ে গেছে। রোদে পুড়ে তার চেহারা তামাটে হয়ে গেছে। হাল্কা বাদামী রঙের ঘন মোটা দাড়ি তার মুখে শোভা পাচ্ছিলো। সে ডেক থেকে তার বাবাকে

চিৎকার করে ডেকে উঠলে তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেনো একটা বন্যভাব ফুটে উঠলো। তার বাক্সে লুকানো ছিলো একটা রিভলবারের মডেল— বার বার গুলী না ভরেই ওটা থেকে পর্যায়ক্রমে গুলী ছোঁড়া যায়। অন্ততঃ এ রকম হবে বলেই স্যামের ধারণা ছিলো।

বাড়ি ফেরার পর তার বাবা ক্রিস্টোফার অনেকক্ষণ ধরে মডেলটা পরীক্ষা করলেন। অবশেষে তিনি বললেন,-'স্বীকার করছি, জিনিসটা বেশ কৌশলের এবং বুদ্ধি খাঁটিয়ে তৈরি। কিন্তু স্যাম, এটা এমনিতে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে, ওটা দিয়ে উন্নততর কিছু একটা কাজ হবে।'

স্যাম বাবা'র সাথে তার কল্পিত এবং উদ্ভাবিত পিস্তলের বিষয়ে জোর তর্ক জুড়ে দিলো,—'এটাই কার্যকরী হবে, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করেই আমি এটা তৈরি করেছি বাবা। বাবা, আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এরকম একটা বন্দুকের কাছে অন্য সব আগ্নেয়াস্ত্র একেবারে খেলনা জিনিস হয়ে দাঁড়াবে! চাই কি, বিশ্ববাসীকে আমি অবাক করে দেবো।'



স্যামুয়েল কোল্ট-এর হাতে চাকু দিয়ে তৈরী কাঠের মডেল বন্দুকের আধুনিক রূপ

এই রিভলবার সত্যি-সত্যি কাজ করবে কিনা, তা জানার একটা মাত্র পথ আছে। ইস্পাতের একটা মডেল তৈরির জন্যে একজন অভিজ্ঞ বন্দুক-মিস্ত্রী নিয়োগ করতে হবে। তা করা ব্যয়সাপেক্ষ। তবু অমায়িক এবং সন্তানের প্রতি যত্নবান বাবা ক্রিস্টোফার স্যামের আবিষ্কারের সম্ভাবনা উপলব্ধি করলেন। আবারো ক্রিস্টোফারের মন্তব্য,—'এর মতো দ্বিতীয় আর একটাও নেই।' তিনি দেখলেন, ছেলেটার কথার কোনো বিরাম নেই। —'আমার বন্দুক আগ্নেয়াস্ত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেবে।'—এ কথা শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে গেলো। শেষে মিঃ ক্রিস্টোফার একটা পরীক্ষামূলক মডেল তৈরির জন্যে বেশ কিছু ডলার দেবেন বলে স্যামকে কথা দিলেন।

'এন্‌সন্ চেজ' নামক 'হার্টফোর্ডের' এক বন্দুক-মিস্ত্রীকে দিয়ে স্যাম ও তার বাবা স্যামের উদ্ভাবিত বন্দুকের মডেলটা তৈরি করালো। রিভলভারটা তৈরি হয়ে গেলে স্যাম আর তার বাবা ওটা পরীক্ষা করার জন্যে বাড়ি নিয়ে গেলেন। স্যাম রিভলভারটা শক্ত করে বেঁধে একটা গাছকে লক্ষ্য করে ওটার ট্রিগারের সঙ্গে একটা লম্বা তার লাগিয়ে নিলো। তারপর সেটার ঘোড়া টেনে সে পিছনে সরে এসে তারটি ধরে দিলো টান। সঙ্গে সঙ্গে

একটা বিরাট বিস্ফোরণ। লোহার স্প্লিন্টারগুলো বা টুকরোগুলো চারদিকে ছুটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্যাম ও তার বাবা মাটিতে শুয়ে পড়লেন। স্থানটি বেশ ধূমায়িত হয়ে গেলো। ধোঁয়া সরে যাবার পর স্যাম গম্ভীরভাবে তার বন্দুকের ভাঙা টুকরোগুলো পরীক্ষা করতে এগিয়ে গেলো। সে যা ভয় করেছিলো তাই হয়েছে। অন্যান্য চেম্বারে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার ফলে সবগুলো গুলী একত্রে ফেটে পড়েছে এবং বন্দুক ভেঙে পড়ায় সে তা বুঝতে পারলো— এটাই প্রধান কারণ।

স্যামুয়েলের বাবা এগিয়ে গিয়ে স্যামের কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন,—'লক্ষী-সোনা বাবা আমার, দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। ওটা দিয়ে কাজ না হলেও তোমার পিস্তলটা সত্যি একটা নতুন ও চমৎকার আবিষ্কার এবং কার্যক্ষম অস্ত্র। দেখো, কখন যে তুমি এক নতুন আবিষ্কারে হাত দিয়ে ফেলবে, তা তুমি হয়তো নিজেই বুঝতে পারবে না।'

স্যাম গম্ভীর ও বিষণ্ন মুখে ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো,—'যতো সতর্ক ভাবে করেছি বলে আমার ধারণা ছিলো, আমি জিনিসটা ততো সতর্কতার সঙ্গে করতে পারিনি বাবা। তবুও আমার বিশ্বাস, আমি ওটাকে সত্যিকার কাজের উপযোগী করে তৈরি করতে পারবো একদিন না একদিন। আর তাছাড়া, অন্য কিছু আবিষ্কারের প্রতি আমার আগ্রহ নেই।'

স্যাম ড্রইং বোর্ডে ফিরে গিয়ে নতুনভাবে ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের নকশা তৈরি করলো। এবার সে গুলীর চেম্বারগুলোকে ইস্পাতের পর্দা দিয়ে আলাদা-আলাদা খাঁজ তৈরি করে মজবুতভাবে পৃথক-পৃথক কামরা তৈরি করে দিলো। এবার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে না বলেই তার বিশ্বাস। নকশাটা দেখার পর তার বাবা আরেকটা মডেলের খরচ 'দিতে রাজী হলেন।' এন্ -সন্চেজ সেই পুরনো বন্দুকের মিস্ত্রী কাজে লেগে গেলো। কিন্তু তারা আবারো হতাশ হলো। এবারের কারণটা অবশ্য ভিন্ন। একত্রে সব চেম্বারে বিস্ফোরণ বন্ধের জন্যে স্যামের প্রক্রিয়াটা খুবই ফলপ্রসু হলো। কিন্তু মডেলের সিলিন্ডারটা জায়গা মতো আটকে থাকলো না। স্যামুয়েল তাই আবারো একটা নকশা তৈরি করলো। বন্দুক মিস্ত্রী চেজ-ই তৃতীয় মডেলটি তৈরি করলো। এবার কিন্তু ওটা থেকে কিছুতেই গুলী ছোঁড়া সম্ভবপর হলো না। এবার ভেঙে পড়লেন বাবা ক্রিস্টোফার।

স্যামের বাবা ক্রিস্টোফার কিছুটা মনোক্ষুণ্ন হয়েই হাত গোটালেন। রেশম-মিলের ব্যবসাও খুব ভালো যাচ্ছিলো না। নগদ ডলার আতশবাজীর ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেবার মতো প্রচুর সঙ্গতি তাঁর ছিলো না। হতে পারে, রিভলভারের ব্যাপারটা অভিনব; কিন্তু ওটাকে নিখুঁতভাবে তৈরি করতে শত শত, এমন কি হাজার-হাজার ডলারের প্রয়োজন হতে পারে। হয়তো এটা কোনোদিনই স্যামের কাঙ্খিত রূপে কার্যকরী হবে না। কার্যকরী হলেও এটা এমন বৈপ্লবিক যে, এটা কোনোদিনই হয়তো জনসাধারণের স্বীকৃতি পাবে না। এটা সহজ লভ্য নয় তাই।

সরলমনা সন্তানের প্রতি যত্নবান বাবা ক্রিস্টোফার তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিলেন,—'তোমার আবিষ্কারের কথা ভুলে গিয়ে আবার সমুদ্রে নাবিকের কাজেই ফিরে যাও বাবা। কার্ভো জাহাজ ছেড়ে আসার সময় ক্যাপ্টেন মিঃ স্পল্ডিং তোমার খুব প্রশংসা করেছিলেন। তোমাকে আবার নাবিকরূপে ফিরে পেলে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। পরবর্তী যাত্রায় হয়তো তুমি অফিসারের পদমর্যাদা পেয়ে যেতে পারো। দেখো স্যাম, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব দ্রুত উন্নতি হচ্ছে আর আজকাল এ্যামেরিকার জাহাজ গুলো সমস্ত বিশ্ব জুড়ে বাণিজ্যের জন্যে বন্দর থেকে বন্দরের লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তোমার মতো বুদ্ধিমান, সৎ চরিত্র ও চালাক ছেলের জন্যে জাহাজের চাকুরি একটা চমৎকার এ্যাডভেঞ্চারাস পেশা।'

এ কথা শুনে স্যাম আঁতকে উঠলো! প্রথম সমুদ্র যাত্রাতেই স্যাম তার জীবনকে খাঁপ খাওয়াতে পারেনি—তার পছন্দও হয়নি অথই সমুদ্রের নোনা পানি ও নিঃসঙ্গতা। তাছাড়া তার আবিষ্কারকে ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছেও তার নেই।—'এই পিস্তলের পিছনে এতো খেটেছি যে, এখন আর সেটাকে ফেলে রাখতে পারি না। আমার স্থির বিশ্বাস, এটাকে আরো নিখুঁত করতে পারবো। এটার পিছনে আরো ক'টা দিন আমাকে নষ্ট করতে দাও বাবা। আমি তোমাকে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, বাবা।'

ছেলের এই রকম স্থির সিদ্ধান্তের কথা শুনে উত্তরে তার বাবা বললেন,— 'তুমি এই পিস্তলের পিছনে কাজ করে তোমার বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে বলে এমন তরো আশা তুমি করতে পারো না। বাজে কাজের পেছনে আমার ঘাম ঝড়ানো কষ্টে রোজগারের ডলার কেবল ঢেলে যাবো, তা তুমি কেমন করে ভাবতে পারো? এমনিতেই তোমার আবিষ্কারের পিছনে অনেক অর্থ-কড়ি খরচ এবং চেষ্টা করে দেখেছি। কথাটা একটু মন দিয়ে ভেবে দেখো। সমুদ্রে ফিরে যেতে না চাইলে তোমার জন্যে নিজস্ব কল-কারখানায় সব সময়ই জায়গা রয়েছে।'

তখনকার মতো রেশম কারখানার কাজে ফিরে যেতে স্যাম রাজী হলো। কারখানায় কাজে ফিরে যাবার আগে সে তার রিভলবারের নকশায় আরো নতুন কিছু পরিবর্তন সাধন করলো। তারপর আরো বেশী করে ক'টা পরীক্ষামূলক মডেল তৈরি করার জন্যে সে তার সাগরে নাবিক থাকা কালীন জমানো এক বছরের সব ডলার 'এন্সন্ চেজ'কে দিয়ে দিলো। পররর্তী কয়েক মাসে, যখন স্যাম কারখানায় কাজ করছিলো, তখন বন্দুক মিস্ত্রী চেজ কাজের উপযোগী এক জোড়া রিভলবার তৈরি করতে সমর্থ হলো। কিন্তু সেগুলোও তেমন কিছু আহামরী ভালো কাজ দিচ্ছিলো না। সেগুলো স্যামের কাঙ্খিত সহজে কার্যক্ষম নিখুঁতভাবে তৈরি রিভলবার হয়নি। স্যাম গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলো, তার বাবার কথাটাই ঠিক। তার আসল কাঠের মডেলটা সবার পছন্দসই আগ্নেয়াস্ত্রে পরিপূর্ণ রূপ নিতে অনেকদিন, অনেক সময় ব্যয় করতে হবে। শুধু বহু সময়ই লাগবে এটাই শেষ কথা নয়, ডলারও লাগবে বিরাট অঙ্কের। অনেক আকাশ-পাতাল ভাবলো

স্যাম। কিন্তু উপযুক্ত পন্থা স্যাম ভেবে পেলো না, সে ডলার পাবে কোথা থেকে? তার বাবা যখন তার এই কাজে আর ডলার দেবেন না বলে সরাসরি তাকে জানিয়ে দিয়েছেন সেখানে অন্যকে কিসের ভরসা? কোনো ভরসা নেই,—তখন স্যাম নিজেই সিদ্ধান্ত নিলো, তাকেই নিজের থেকে এই খরচের ডলার জোগাড়ের উপায় বের করতে হবে।

রেশম কারখানার রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে সে আশ্চর্যজনকভাবে এর একটা সুন্দর উত্তর পেয়ে গেলো। স্যাম যখন সমুদ্রে তখন মিলের কেমিস্ট 'বিল স্মিথ' কাগজে 'স্যার হামফ্রি ডেভী'র 'নাইট্রাস্ অক্সাইড' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা পড়েছিলো। 'হাসির গ্যাস' নামেই এটা বেশি পরিচিত। বিখ্যাত ইংরেজ রসায়নবিদ 'ডেভী' আবিষ্কার করলেন যে 'নাইট্রাস্ অক্সাইড' যা প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে দেহে একপ্রকার ক্ষণস্থায়ী নির্দোষ মাতলামির সৃষ্টি হয়। কেউ-কেউ উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়েন আর কল্পনার পাখা মেলে দেন। অনেকে অবিশ্বাস্য শারীরিক কসরত যা সত্যিকার এ্যাক্রোবোটিং-এর মতো দেখাতে শুরু করেন। কিছু লোক গভীর ও মুগ্ধ দিবাস্বপ্নে গা এলিয়ে দেন। এই হাসির গ্যাসের যা এখন 'ল্যাফিং গ্যাস' তার ক্রিয়া মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। একবার যে এই গ্যাস গ্রহণ করেছে সে আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

বিল স্মিথ 'নাইট্রাস্ অক্সাইড' তৈরি করা শিখে ফেলেছে। প্রক্রিয়াটা তার কাছে খুবই সহজ। গ্যাসের সম্বন্ধে তার যা কিছু জানা ছিলো তা সে স্যামকে স্বেচ্ছায় শিখিয়ে দিলো। দুই বন্ধুতে মিলে কোনো-কোনো বিকেলে একে অন্যের উপর 'নাইট্রাস্ অক্সাইড' প্রয়োগ করে বেদম হাসির ফোয়ারা সৃষ্টি করতো। কিন্তু ওখানে কী সব যে হচ্ছিলো সে বিষয়ে মিলের শ্রমিকদের কোনো ধারণাই ছিলো না—তবে তাদের স্থির বিশ্বাস, রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে দুটো আস্ত গারদে পুরে রাখার মতো পাগল বাস করে।

স্যামের পাগলামির মধ্যেও ঠিকই তার একমাত্র কাঙ্খিত অর্থ রোজগারের পথ খুঁজে বের করে নিলো। তার খেয়াল হলো যে, সাগরে এক বছরে সে যতো ডলার আয় করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি ডলার 'হাসির গ্যাস' দিয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আয় করার সুযোগ রয়েছে। এবং এই কাজের জন্যে তাকে শুধু একটা সহজে বহনোপযোগী ল্যাবরেটরি বা গ্যাস তৈরির হাল্কা চেম্বার তৈরি করতে হবে। তারপর নিউ ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলের পল্লীতে-পল্লীতে 'নাইট্রাস্ অক্সাইডে'র খবর একবার চোঙ্গা ফুঁকে পৌঁছে দিলেই চলবে। এভাবে সে নিশ্চয়ই একদিন দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর সঙ্গে সকলের গ্রহণযোগ্য তার বন্ধুর আবিষ্কার 'হাসির গ্যাস' বিরাট আলোড়ন ও সুনাম অর্জনে সমর্থ হবে। নিউ ইংল্যাণ্ডের অনেক অঞ্চলেই হাল্কা আমোদ-প্রমোদকে নীতিহীন মনে করে খারাপ নজরে দেখা হতো। উদাহরণস্বরূপ যা বলবো তা শুনে এই আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশের প্রথম শিক্ষিত লোকজনও আশ্চর্য হবেন। তা হলো,—সমস্ত 'কানেক্টিকাট' অঙ্গরাজ্যে একটিও থিয়েটার মঞ্চ ছিলো না। তবে 'হাসির গ্যাসে'র প্রদর্শনী একাধারে বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক হবে এটা একটা প্রধান ভরসা। ওটা যদি আবার

আমোদের ব্যাপার হয় তাহলে তো আরো ভালো। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে সেই আমোদ-প্রমোদ থাকবে, তার ব্যাপারে ভীষণ গোঁড়া কোনো পিউরিটানও আপত্তি তুলতে পারবে না। বরঞ্চ তাকে অঙ্গরাজ্যের লোকেরা অভিনন্দিত করবে।

স্যাম একটুও দেরি করলো না। সে কতোগুলো বোতল, টিউব, রিটোর্ট (কাঁচের বক্র নল) এবং প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও রবারের পাইপ লাগানো একটা চেপ্টা মতো জিনিস জোগাড় করলো। তারপর একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সে সবগুলো ভর্তি করলো সে। এবার তার যাত্রা শুরু। 'ওয়ে আর' ও 'হার্টফোর্ডে'র মধ্যবর্তী ছোটো-ছোটো শহরের চারপাশের গ্রাম্য রাস্তা ধরে ঘুরতে লাগলো সে। কোনো জনপদে আসার পর সেই জনপদের রাস্তার চৌ-মাথায় বা গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠে তার সরঞ্জামাদি সাজিয়ে রেখে কৌতুহলী দর্শক জমা হবার অপেক্ষায় বসে থাকতো। তারপর আস্তে-ধীরে তার চারপাশের লোকজনকে মানে নিজেকে, 'হাতে-কলমে বিজ্ঞানী' বলে দর্শকদের কাছে তার পরিচয় দিতো। তখনো স্যাম মাত্র সতেরো বছরের তরুণ। তবে সাগরে নাবিক থাকাকালীন গজানো তার দাড়ি আরও কিছুটা বড়ো হওয়ায় অবশ্য বয়সের চাইতে তাকে একটু বেশী বয়স্ক মনে হতো। তার বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের প্রদর্শনী শহুরে লোকদের মধ্যে খুব আনন্দময় বিস্ময়কর ধারণার সৃষ্টি করেছিলো।

একবার কিছু লোক জড়ো হলে স্যাম 'নাইট্রাস্ অক্সাইড' সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতায় এই গ্যাস-"আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর অন্যতম" বলে উল্লেখ করলো। তারপর কিছুটা গ্যাস তৈরি করে নলের মুখের চোঙ্গাটা তার নাকে মুখে ধরে সে নিজের উপর এই গ্যাসের প্রভাব প্রদর্শন করলো। এ গ্যাসের কোনো খারাপ প্রভাব নেই, সে বিষয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করে এবার যারা এ গ্যাস নিজেরাই গ্রহণ করতে চায় তাদের স্যাম ডাক দিতো। কিছু কিছু সাহসী দর্শক স্যামের প্যাকিং বাক্সের ল্যাবরেটরীর কাছে এসে উৎসাহ নিয়ে দাঁড়াতো। তারা সবাই তার বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পরীক্ষা করতে ভীষণ রকম উদগ্রীব হয়ে উঠতো। স্যামের অকল্পনীয় অঙ্গভঙ্গি জনতার আমোদের সামগ্রী হলো। ইতিপূর্বে এরকম আমুদে আর কিছু তারা এ শহরে কখনো দেখেনি।

কিছুদিনের মধ্যেই স্যামের বিজ্ঞান আর গ্যাস হাসির তামাশায় সংমিশ্রণ ভীষণ আলোচিত হলো। একদিনেই স্যাম তার তামাশার সরঞ্জামাদি নিয়ে নানান শহরে ঘুরে বেড়াতো। যখনই সম্ভব হতো তখনই সে বিনা পয়সায় ঘোড়ার গাড়ি ও মালগাড়িতে চড়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতো। প্রতিবার তামাশা দেখানোর পর সে হ্যাটটা উল্টো করে ধরে বাড়িয়ে দিয়ে দর্শকদের ধারে কাছে এগিয়ে ধরতো। তাতে যে ডলার আসতো তা ছিলো স্যামের কাছে আশাতীত, অকল্পনীয়!

তামাশার কথা প্রচারে সত্যিকারের একজন ভদ্র জোকারের লক্ষণ অতি দ্রুত তার মধ্যে প্রকাশ পেলো। নতুনত্বের প্রথম পর্যায়ে সবচেয়ে বড়ো অক্ষরে সে বেশ কিছু

হ্যাণ্ডবিল ছাপালো। তবে কোনো স্থানে —গ্রামে বা শহরে খেলা দেখাতে যাওয়ার পূর্বেই সে এগুলো, গ্রামে-নগরে-বন্দরে পাঠিয়ে দিতো। ফলে সব সময়ই দর্শকগণ তার অপেক্ষায় অধীর হন্যে হয়ে বসে থাকতো। পরে মুগ্ধ দর্শকদের কেউ-কেউ তাকে 'ডাক্তার' বলে সম্বোধন করায় এই মোক্ষম সুযোগ গ্রহণ করে সে নিজেকে 'ডাঃ কোল্ট' বলে পরিচয় দিতে শুরু করে দিল। কিছুদিন পর সে তার পারিবারিক নামের একটা পুরোনা বানান গ্রহণ করে নিজের নাম 'ডাঃ কোল্ট' ছাপালো। এটা আরো বেশি জমকালো মনে হলো তার কাছে। সর্বশেষে সে নিউইয়র্ক, লন্ডন ও কোলকাতায় নিজেকে 'ডাঃ কোল্ট' রূপে নিজেই প্রচার করলো। সমুদ্র যাত্রায় সে লন্ডন ও কোলকাতায় আর ছোটোবেলায় একবার তার বাবার সঙ্গে নিউইয়র্কে গিয়েছিলো। তাই কথাটা কেউ আর তাকে মিথ্যে প্রচার করছে—একথাও বলতে পারবে না।

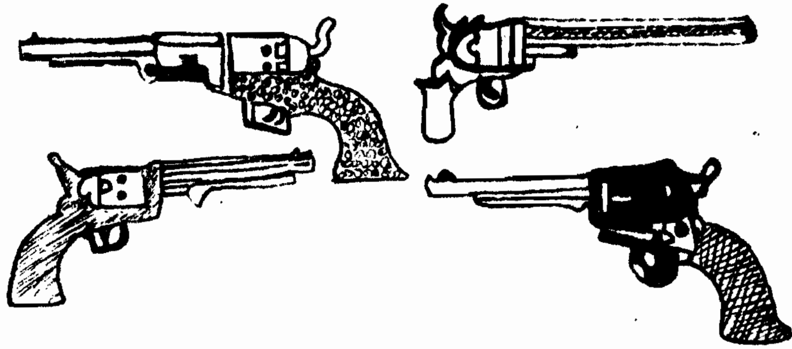
এসব খেলা দেখিয়ে-দেখিয়ে দু'মাসের মধ্যে স্যাম অনেক অর্থ-কড়ি জমিয়ে ফেললো। 'এন্‌সন্ চেজ'কে তার বন্দুকের সর্বশেষ পরীক্ষামূলক মডেলগুলো তৈরির খরচ এবং ওয়াশিংটনে গিয়ে পেটেন্ট-এর রেজিস্ট্রেশনের জন্যে দরখাস্ত করার ব্যাপারে যাতায়াতের খরচ বাবদ যা ছিলো সেটাই যথেষ্ট। বাড়ি গিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা করে আসা এবং বাড়িতে পূর্বের রক্ষিত তার মডেলগুলো নিয়ে আসার জন্যে সে বাড়ির পথে রওয়ানা হয়ে গেলো।

ডলার রোজগারের এই অদ্ভুত পরিকল্পনার কথাটি বাড়ি গিয়ে সে বাবার কাছে খুলে বললো। একথা শুনেই স্যামের বাবা আঁতকে উঠলেন। তবে এটাও ঠিক, তাঁর ছেলের আবিষ্কারের খরচ চালাবার দৃঢ়তা ও একাগ্রতা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাই মিঃ ক্রিস্টোফার বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করলেন না। বরং তিনি তাঁর পুরানো বন্ধু 'হেনরী এলসওয়ার্থ' ওয়াশিংটনের 'কমিশনার অব্ পেটেন্টস্'-এর নিকট একখানা পত্র লিখে দিলেন।

স্যাম আশায় উল্লসিত হয়ে রাজধানীর উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। পকেটে ডলার, পেটেন্ট কমিশনারের বরাবরে বাবার দেয়া পরিচয়পত্র আর তার রিভলবারের সর্বাধুনিক মডেলগুলি থাকতে রেজিস্ট্রেশন-এর ফল কোনো কিছু খারাপ হতে পারে না এটা স্যামের বদ্ধমূল ধারণা।

মিঃ এলস্‌ওয়ার্থ স্যামকে স্বপ্ন জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি রিভলবারগুলো পরীক্ষা করে স্বীকার করলেন যে, জিনিষগুলো খুবই চমৎকার হয়েছে। কিন্তু স্যামের এই আবিষ্কারগুলো পেটেন্ট করার মতো উচ্চমানে এখনো পৌঁছায়নি। মডেলগুলো এখনো সূক্ষ্মভাবে তৈরি হয়নি। তাছাড়া, এগুলোতে আরো অনেক উন্নতি সাধনের প্রয়োজন। পেটেন্ট অফিসের গোপনীয় রক্ষণাগারে তার দুটো মডেলসহ তার রিভলবারের একটা বিবরণ পেশ করার জন্যে মিঃ এলস্‌ওয়ার্থ স্যামকে উপদেশ দিলেন।

আনুষ্ঠানিক পেটেন্টের জন্যে দরখাস্ত করার সঠিক সময় না হওয়া পর্যন্ত এভাবে তার আবিষ্কার রক্ষিত থাকবে এই পেটেন্ট অফিসের মালখানায়। এরপর



স্যামুয়েল কোল্ট-এর বানানো বিভিন্ন রিভলভার যা পেটেন্ট-এর জন্যে জমা দেয়া হয়েছিলো।

এলস্‌ওয়ার্থ স্যামকে কাজ চালিয়ে যেতে বললেন এবং স্যাম-এর বাবা— তাঁর বন্ধুকে একটা চিঠি লিখে জানলেন,—

প্রিয় বন্ধু ক্রিস্টোফার,

বন্ধু, তোমার চিঠির জন্য শুভেচ্ছা।

—'স্যামুয়েল এখন এখানে তার নতুন আবিষ্কার নিয়ে বেশ অগ্রসর হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ও বিখ্যাত সব লোকেরা তার আবিষ্কারের খুব প্রশংসা করেছেন। আশা করছি, সে তার প্ররিশ্রমের জন্যে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। আমি তাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হবো...'

বাবার বন্ধু শ্রদ্ধেয় এলস্‌ওয়ার্থের আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে রাজধানীতে সবচেয় ভালো এক বন্দুক মিস্ত্রী পাওয়া গেলে, স্যাম তাকেই নিযুক্ত করলো। লোকটি বাল্টিমোরের— নাম, 'জন পিয়ার্সন'। স্যাম পিয়ার্সনকে তার সব সরঞ্জাম ও একমাসের বেতনের সবটা অগ্রিম দিয়ে দিলো। তার জমানো ডলার এতে প্রায় শেষ হয়ে গেলো। তাই আবার সে ছদ্মনামের 'ডাঃ কৌল্ট' হিসাবে পথে বেরিয়ে পড়লো। প্রথম কয়েক সপ্তাহ সে ওয়াশিংটন ও বাল্টিমোরের চারপাশের ক্ষুদ্র শহরগুলো ভ্রমণ করলো। 'হাসির গ্যাস' বিপুল উৎসাহী জনতা আকর্ষণ করছে দেখে স্যাম বুঝতে পারলো, ছোটো-ছোটো জনপদে গিয়ে সে হয়তো তার সময় অনেক বেশী নষ্ট করছে। হয়তো বা সে তার প্রদর্শনী পেশাদারী ভিত্তিতে দেখিয়ে বড়ো বড়ো শহরের থিয়েটার ও হলগুলোতে অনেক বেশি বেশি রোজগার করতে সক্ষম হবে—এবং স্যাম তাই স্থির করলো,—রাজধানী শহরের সেরা

হলগুলোয় এবং সেই সাথে সেরা স্থানে প্রদর্শনী করবে। প্রথম লক্ষ্য হিসাবে সে বোস্টন শহরকে নির্বাচন করলো। দেশের মধ্যে এ শহরটাই সবচেয়ে বেশি শহুরে ও আমুদে মনের স্বচ্ছল লোক-জনের বসবাস। বোস্টনের 'ম্যাসোনিক টেম্পল' শহরের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্থল। স্যাম বুঝেছিলো,— যদি সে 'ম্যাসোনিক টেম্পল' দর্শক দিয়ে ভর্তি করতে সক্ষম হয়, তাহলে এ্যামেরিকার অন্য যে কোনো স্থানে তার হল ভর্তি করতে কষ্ট হবে না বিন্দুমাত্র।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। স্যাম যথারীতি এর কিছুদিন পর বোস্টনবাসীদের মধ্যে অসংখ্য হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে দিলো। তাতে বিজ্ঞাপন হিসেবে লেখা ছিলো অনেক কথা। যেমন তাতে লেখা ছিলো ঃ-

'আসুন! আসুন!! আসুন!!!'

'বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-বক্তৃতা ও কৌতুক তামাশা! স্থান ঃ ম্যাসোনিক টেম্পল, ২১শে ও ২২শে জুন! দেখাবেন, তামাশা ও হাসির বোম, ডাঃ কোল্ট! নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন ও কোলকাতায় পূর্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি। এবার বোস্টনে। টিকিট মাত্র ঃ ২৫ সেন্ট! আপনি আমন্ত্রিত।

১৮৩২ সনের ২১শে জুন সন্ধ্যায় 'ম্যাসোনিক টেম্পলে'র মঞ্চে পা দিয়ে ডাঃ কোল্ট হল ভর্তি উৎসাহী দর্শকের সম্মুখীন হলো। স্যামের ১৮তম জন্মদিনের তখনো আরো পুরো একটি মাস বাকি! কিন্তু তাকে এই পোশাকে দেখতে খুবই ভারিক্কি মনে হচ্ছিলো। তার গায়ে ছিলো, আনকোড়া কালো লম্বা কোট আর মাথায় ছিলো লম্বা রেশমী হ্যাট। দাড়ি সুন্দরভাবে ছাঁটা। রূপোলী সুতোর কাজ-করা কালো কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিলের উপর ছিলো তার বৈজ্ঞানিক নানা রকম সরঞ্জাম। মঞ্চে দর্শকদের কিছুটা সামনে এসে গলা পরিষ্কার করে সে বিজ্ঞজনোচিতভাবে ঘোষণা করলো,—

—"নাইট্রাস্ অক্সাইড আমাদের যুগের আজ অব্দি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর অন্যতম। প্রাণীর দেহে এই বিশেষ পদার্থের মিশ্রণের অদ্ভুত প্রভাব সর্ব প্রথম বিখ্যাত ইংরেজ রসায়নবিদ 'স্যার হামফ্রী ডেভী' লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে 'নাইট্রাস্ অক্সাইড' স্নায়ুতন্ত্রীতে অত্যাশ্চর্য প্রভাবের সৃষ্টি করে...।"

নাটকীয় ভঙ্গিতে ডাঃ কোল্ট মঞ্চের আরো একটু সম্মুখে গিয়ে দর্শকদের দিকে সামান্য ঝুঁকে বললো,—"নিঃশ্বাসের সঙ্গে এ গ্যাস গ্রহণ করলে কোনো কোনো-লোক হাসে, কেউ কেউ গান গায়, আবার কেউ-কেউ আবৃত্তি ও বক্তৃতার তুবড়ি ছোটায়। বেশির ভাগ লোকের মধ্যে শারীরিক কসরতের মানে, এ্যাক্রোবেটিং-এর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব দেখা দেয়— যেমন কুস্তি ও বক্সিং। তারা আবার মাঝে মাঝে অসংখ্য অবিশ্বাস্য রকমের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ করে বসে। 'নাইট্রাস্ অক্সাইড'-এর অনুভূতি খুবই

আনন্দদায়ক এবং এতে কোনোরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা কু-ফল দেখা দেয় না। দর্শকদের মধ্যে এ গ্যাস প্রয়োগ করার পূর্বে আমি নিজের উপর এর অসাধারণ ফলাফল প্রয়োগ করে ব্যাপারটা যে বিশ্বাসযোগ্য সেটা দেখাতে চাই আজকের উপস্থিত গুণীজনদের।"

নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে তার বক্তৃতা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে ডাঃ কোল্ট দর্শকদের মন জয় করে ফেললো। তাই ২১শে জুনের প্রদর্শনী অত্যাধিক সফল ও লাভজনক হলো। বোস্টন ত্যাগ করার সময় স্যামের পকেট ভর্তি ছিলো শুধু ডলার আর ডলারে। ফলে দেশের প্রতিটি বড়ো বড়ো শহরে এসব বৈজ্ঞানিক তামাশা দেখানোর জন্যে স্যাম তৈরি হয়ে গেলো বেশ পাকা পোক্ত ভাবেই।

আশ্চর্য—পর্যায়ক্রমিক ঠিক তাই করলো স্যাম! পরবর্তী তিন বছর ধরে সে এ্যামেরিকার ২৪টি অঙ্গরাজ্যের বেশির ভাগই ভ্রমণ করলো। এ সময়ে সে স্ট্রেটকোচ, স্টিমবোট আর নতুন দু'বগি রেলে চড়ে ভ্রমণ করেছিলো। দক্ষিণে 'নিউ অর্লিয়েন্স' আর উত্তরে 'কানাডা' ছিলো তার যাতায়াতের সীমা। 'সিন্‌সিনাটি'র অন্তর্গত 'পশ্চিমের রানী' বলে বিখ্যাত শহর 'ডর্ফেভিলে'র 'ওয়েস্টার্ন মিউজিয়ামে' বেশ কয়েক মাস ধরে সে তার প্রদর্শনী দেখিয়েছিলো।

সব সময়েই অভিনয়কে সৃজনশীল, রুচিশীল করার প্রচেষ্টা ছিলো তার। সে নানা ধরনের নতুন-নতুন খেলার সংমিশ্রন করলো তার বর্তমান খেলার সাথে। প্রচারকার্যেও পারদর্শী হয়ে উঠলো সে। সে আস্তে আস্তে তার—"আসুন! আসুন!! আসুনু!!!" ধরনের প্রচারপত্র ত্যাগ করে আরো বেশি মার্জিত ভাষা সম্পন্ন ঘোষণার ব্যবহার শুরু করলো। তা ছিলো নিম্নরূপ —

"—ডাঃ কোল্ট (ইতিপূর্বে নিউইয়র্ক, লন্ডন ও কোলকাতার) লোয়েল ও তার আশে-পাশের ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের নিকট সবিনয় নিবেদন করেছেন যে, অদ্য সন্ধ্যায় তিনি টাউন হলে 'নাইট্রাস্ অক্সাইড' বা হাসির গ্যাসের উপর বক্তৃতা দেবেন ও তা প্রয়োগ করবেন.......ডাঃ কোল্ট হাতে কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত রসায়নবিদ, তাই দুষিত গ্যাস প্রয়োগের কোনো ভয় নেই। তাছাড়া, বিজ্ঞানে দখল আছে এমন যেকোনো ভদ্রলোকের পরীক্ষার্থে তিনি তাঁর উদ্ভাবিত সরঞ্জাম দেখাতে প্রস্তুত। ডাঃ কোল্ট এ্যামেরিকার বিভিন্ন শহরে অগণিত অভিজাত মহিলা ও পুরুষ দর্শকবৃন্দের সামনে এই গ্যাসের অসাধারণ আশ্চর্য গুণাবলী প্রদর্শন করেছেন। তিনি বিশ হাজারের অধিক লোকের উপর এটা প্রয়োগ করেছেন এবং নিজে এক হাজার বারেরও বেশি গ্রহণ করেছেন।"

—যেখানেই গেছে সেখানেই স্যাম হল ভর্তি লোকের সামনে তার খেলা দেখিয়েছে। নিম্নে বর্ণিত সংবাদপত্রের খবর থেকেই বোঝা যায়, যে স্যাম তার দর্শকদের

টিকেট কিনে প্রদর্শনী দেখার তুষ্টি পুরোপুরিই দিয়েছে। নিম্নে একটি পত্রিকার খবরের অংশ বিশেষ তুলে দেয়া হলো,—

'ডাঃ কোল্টে'র গ্যাসের আশ্চর্য প্রভাব দেখার জন্যে গত সপ্তাহে যে উদ্দীপনা আমরা লক্ষ্য করেছি এ রকম আর কখনো দেখা যায়নি। প্রতি সন্ধ্যায় মিউজিয়ামে ঠাঁই হতো না। আগ্রহ এতো তীব্র ছিলো যে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই ডাক্তার দুটো করে প্রদর্শনী দেখাতে বাধ্য হয়েছেন...

ডাঃ কোল্ট হিসেবে স্যামের এই প্রদর্শনীর অভিযান কাহিনী নিয়েই একটা স্বতন্ত্র মোটা আকারের গ্রন্থ হতে পারতো। উদাহরণ স্বরূপ মুদ্রিত আকারে বই প্রকাশের কথা বলা যায়।

প্রদর্শনীতে অংশ নেবার জন্যে একবার স্যাম 'সিন্‌সিনাটি'তে ছ'জন 'লাল ভারতীয়'কে ভাড়া করলো। সেই সন্ধ্যায় 'ডর্ফেভিল মিউজিয়াম' লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। সাজ্ঘাতিক 'রেড ইন্ডিয়ান বর্বরদের' উপর 'নাইট্রাস্ অক্সাইডে'র প্রভাব দেখার জন্যে সবাই উদগ্রীব। ভীষণ কিছু হতে পারে মনে করে কেউ কেউ সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলো। কিন্তু রেড ইন্ডিয়ানদের কোনো সহযোগিতা পাওয়া গেলো না। বন্য রণ-হুঙ্কার ছাড়ার পরিবর্তে তারা ঘুমিয়ে পড়লো। তাই প্রদর্শনীর ক্ষতি হতে পারে মনে করে স্যাম শঙ্কিত হয়ে পড়লো। সে তাদের ভীষণ জোড়ে গাল পারলো, শরীর ধরে নাড়া দিলো, শেষে তাদের কানে জোরে জোরে চিৎকার করলো; কিন্তু তাদের জাগাতে সক্ষম হলো না স্যাম।

তাৎক্ষণিক একটা চিন্তার পর স্যাম জনতার দিকে ফিরে গুরুগম্ভীরভাবে ঘোষণা করলো যে, প্রিয় দর্শকবৃন্দ 'নাইট্রাস্ অক্সাইড'-এর অদ্ভুত গুণাবলীর আরো একটির প্রমাণ পেলেন। নিশ্বাসের সাথে সামান্য একটু গ্যাস যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ সাংঘাতিক লাল-ইন্ডিয়ানগুলো কেমন মৃতবৎ হয়ে পড়েছিলো—সবাই পরিষ্কার দেখেছেন যে ওরা শিশুর মতো নিরীহ হয়ে গিয়েছিলো।

ভ্রমণের সময়েও স্যাম তার রিভলবারের প্রতি বেখেয়াল থাকতো না। যতোবার সম্ভব স্যাম তার বন্দুক-মিস্ত্রী জন পিয়ার্সনের সঙ্গে পুনঃপুন পরামর্শ করার জন্যে বাল্টিমোরে ফিরে যেতো। চলার পথে বন্দুকটার আরো উন্নতি সাধনে সজাগ থাকতো সে। অবশেষে রাইফেল এবং পিস্তলেও সে রিভলবার পদ্ধতির সন্নিবেশ ঘটালো। ডাঃ কোল্ট হিসেবে সে বহু ডলার রোজগার করলেও তার ভ্রমণে খরচও লাগতো প্রচুর। তাই অনেক সময় বন্দুকের মিস্ত্রী পিয়ার্সনের টাকা পরিশোধ করতে তার অসুবিধায় পড়তে হতো। অবশ্য পিয়ার্সনের সঙ্গে মডেল তৈরীর প্রশ্নে নিম্নলিখিত চুক্তি হয়েছিলো, চুক্তিটি ছিলো,-

"— আমি জন পিয়ার্সন (রবিবার বাদে) প্রতিদিন দশ ঘন্টা করে প্রতি সপ্তাহে দশ ডলার হিসাবে **বারো মাসের জন্যে মিঃ স্যামুয়েল কোল্টে**র কাজ করতে সম্মত আছি। এ থেকে আমার মজুরী, দোকান ও হাপর ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে

চার ডলার করে কাটা যাবে। আমি আমার মজুরী প্রতি সপ্তাহে গ্রহণ করবো। কোনো প্রকার গড় মিল হলে এক মাসের নোটিশ দিয়ে উভয়পক্ষেই এই চুক্তি বাতিল করতে সক্ষম হবো।"

তখনকার দিনে বেতন সপ্তাহে দশ ডলার চাট্টিখানি কথা নয়। স্যামের প্রায়ই এই মজুরীর অর্থ ধার করতে হতো। পিয়ার্সন সঙ্গে-সঙ্গে অনুযোগ করতো। একবার বন্দুক-মিস্ত্রী পিয়ার্সন কাজ ছেড়ে দেবার ভয় দেখালে স্যাম তাড়াতাড়ি তাকে একটি চিঠি লিখেছিলো। সেই চিঠিটা ছিলো এরকম—

"... Sir, I improve this Lies lieshour moment in infoming you that my affairs here are like to terminate as wel as I had expected & on Monday or Tuesday next I wil make you a remitance that wil inable you to commense my work. You can therefore make your arrangements accordingly, At all events dont ingage yourself to anyone until you hear from me again which will be on Monday or Tuesday next (possatively)." **

নিম্নে ক্ষুদে পাঠকবৃন্দের জন্যে চিঠিটা বাংলা অনুবাদ করে দেয়া হলো।

..."স্যার, আমি এই অবসর মুহূর্তে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমার ইচ্ছেনুযায়ীই আমার এখনকার কাজকর্ম সমাধা হবে এবং আগামী সোমবার কিংবা মঙ্গলবারে আপনাকে কিছু মজুরী দেবো। তাতে আমার কাজ শুরু করতে আপনি সক্ষম হবেন। সুতরাং, সে অনুযায়ী আপনি আপনার যন্ত্রপাতি জোগাড় শুরু করতে পারেন। যাই হোক না কেনো,—আমার কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্যন্ত আপনি অন্য কারো কাজে হাত দেবেন না— (অবশ্যই) আগামী সোমবার বা মঙ্গলবারের মধ্যে আপনি আমার খবর পাবেন।"

উনিশ বছর বয়সী স্যাম একজন আবিষ্কারক ছিলো বটে এবং বিজ্ঞানে তার বিস্ময়কর অবদানও অনস্বীকার্য, তবুও ইংরেজীতে লেখা চিঠি পড়ে বোঝা যায়, যে তার অগোছালো শিক্ষাজীবনে সঠিক বানান শিক্ষারও সময় পায়নি। ** তাই ভুল বানানের মূল চিঠিটিই ছাপা হলো।

স্যামের নিয়মিত আর্থিক সঙ্কট এবং মাঝে মাঝে কাজ ছেড়ে দেবার কথা বলে পিয়ার্সনের হুমকি সত্ত্বেও বাল্টিমোরের এই বন্দুক-মিস্ত্রী মনোযোগী ও খুবই বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কারিগর ছিলো এবং তিন বছরের মধ্যে সে স্যামের মডেল অনুযায়ী অনেকগুলো চমৎকার নিখুঁত রিভলবার তৈরি করে ফেললো। ১৮৩৫ সালের প্রথম দিকে স্যাম মনটাকে স্থির করলো এই ভেবে যে, ডাঃ কোল্টের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তার শেষ খেলা দেখাবার পর বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি গুটিয়ে সে বাল্টিমোরে ফিরে এলো। এখানে তার ঘূর্ণায়মান পিস্তল ও রাইফেলের তৈরি কয়েকটা মডেল নিয়ে আবার সে রওয়ানা দিলো রাজধানীর উদ্দেশ্যে। নিয়মনীতি মতো পেটেন্টের জন্যে দরখাস্ত করতে আবার ওয়াশিংটনের দিকে স্যাম যাত্রা করলো দ্বিতীয়বারের মতো।

এবার জমা দেয়া মাত্রই স্যাম-এর 'পেটেন্ট' মঞ্জুর করা হলো। সাগরের অপর তীরে যাতে তার তৈরি অস্ত্রগুলো নকল না হতে পারে সেজেন্য বৈদেশিক পেটেন্ট লাভের উদ্দেশ্যে কয়েক সপ্তাহ পরে এই বিশ বছর বয়সের তরুণ বিজ্ঞানী ইউরোপের পথে রওয়ানা দিলো। এবার তার যাতায়াত খরচ তাকে তার পরিবার থেকে ধার করতে হলো। কেননা, তার অস্ত্রের পরীক্ষামূলক মডেলগুলো তৈরি করতেই 'হাসির গ্যাস' থেকে অর্জিত সমস্ত লভ্যাংশ শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

ইউরোপে এসে স্যাম প্রথমবারের মতো জানতে পারলো যে, স্যাম এবং এলিশা কোলিয়েরেই কেবলমাত্র আবিষ্কারক নন—যারা বাস্তব পুনঃপুনঃ ক্রিয়াশীল অস্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। অন্ততঃ তিনশো বছর পূর্বেও রিভলবারের কার্যপ্রণালী লোকের জানা ছিলো। স্যাম সত্যি ঘটনাটা উদঘাটনের জন্যে অনেকগুলি মিউজিয়ামে গেলো। সেগুলোতে পুরোনো আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচুর সংগ্রহ ছিল। সেগুলোতে গিয়ে সে দেখতে পেলো, পনেরো শতকের আদিম বন্দুকের পশ্চাদ্ভাগও ঘূর্ণায়মান ছিল। সে কোলিয়েরের জিনিস ধার করেছে আর সম্ভবতঃ কোলিয়ের তার পূর্বের বন্দুক-মিস্ত্রীদের কাজ দেখে ধারণা নিয়েছে। পুনরায় গুলী না ভরে কয়েকবার গুলি করা যায় এমন অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা প্রায় আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের প্রথম দিককার ইতিহাসের মতোই প্রাচীন।

সে যাই হোক না কেনো, স্যামের ভাগ্যেই প্রথম সফলতা এসেছে। অদ্যাবধি পুনঃপুন ক্রিয়াশীল অস্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র তার রিভলবারগুলোই স্বয়ংক্রিয় ও সত্যিকারের কার্যক্ষম। স্বয়ংক্রিয় রিভলবার চালনার পক্ষে তার পেটেন্ট বা মডেল এতো মৌলিক যে সেই পেটেন্টের মেয়াদ ফুরোবার আগে অন্য কোনো বন্দুক মিস্ত্রী অনুরূপ রিভলবার আইনতঃ তৈরি করতে সক্ষম ছিলো না।

১৮৩৬ সালের মধ্যে 'আগ্নেয়াস্ত্রে প্রযোজ্য কতোগুলো উন্নতি সাধনের' জন্যে স্যাম যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে পেটেন্ট পেলো। স্বয়ংক্রিয় রিভলবারের তিনটি অত্যাবশ্যক গঠন প্রণালী সংক্রান্তই ছিলো স্যামের সমস্ত পেটেন্টগুলো। ১ রিভলবারের ঘোড়া টানার সাহায্যেই সিলিন্ডার ঘোরানো ২ একই মাধ্যমে দিয়ে নলের সঙ্গে একই লাইনে সিলিন্ডার আটকানোও খুলে দেয়া। ৩ সিলিন্ডারের মধ্যকার সবগুলো গুলীর চেম্বার (কোঠা) যাতে এক সঙ্গে ফেটে না যায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

স্যামের বহু সাধনার ফসল পেটেন্টগুলো কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষিত যশ ও সৌভাগ্য একদিনে এনে দেয়নি। এই কোল্ট রিভলবার জনসাধারণের অনুমোদন পেতে আরো অনেক বছর লেগেছিলো।

কোল্ট রিভলবার উৎপাদনের প্রথম প্রচেষ্টা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের আর্থিক সাহায্য নিয়ে স্যাম নিউজার্সী সিটির 'পেটার্সনে' 'পেটেন্ট আর্মস ম্যানুফ্যাকটোরিং কোম্পানী' করলো। তারপর সে নিজেই তার

আবিষ্কারের গুণাবলী ব্যাখ্যা করে এর প্রচলন বৃদ্ধি করতে দেশের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু তেমন কেনো আশানুরূপ বিক্রি হলো না তার রিভলবার। স্যাম জনগণের সামনে প্রদর্শনী করলো এবং দায়িত্বশীল মিলিটারী ও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করলো। কিন্তু তাঁরা খুব কমই আগ্রহ দেখালো। ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা 'কোল্ট রিভলবার' পছন্দ করলেন না। তাঁদের মতে,—"ওটা খুবই সেকেলে এবং সেনাবাহিনীতে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে না।" তাই জনসাধারণ এই নতুন অপ্রচলিত অস্ত্র সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। কয়েক বছরের মধ্যেই স্যাম ও তার কোম্পানীর মূলধন শেষ হয়ে গেলো।

অন্য জীবিকা গ্রহণে বাধ্য হয়ে স্যাম আবার তার প্রথম আবিষ্কারের কাজেই ফিরে গেলো। পানির নিচে ব্যবহারযোগ্য যুদ্ধজাহাজের জন্যে মাইনকে আরো বড়ো, উন্নততর এবং কর্মক্ষম করার পর নৌ-বাহিনী আগ্রহী হয়ে নিউইয়র্ক নৌ-বন্দরে পরীক্ষাকার্যের জন্যে ব্যবহারার্থে স্যামকে একটা পুরোনো জাহাজ দান করলো। ডাঃ কোল্ট হিসেবে তার যে প্রচার চালানো হয়েছিলো সে কথা স্যাম ভোলেনি। তাই এবারো এই প্রদর্শনীর কথা স্যাম ভালোভাবে প্রচার করলো। নির্দিষ্ট দিনে হাজার হাজার লোক নিউইয়র্কের সেনা নৌ-বন্দরে জমা হয়ে নৌ-বাহিনীর জাহাজটা বিদীর্ণ শব্দে টুক্‌রো টুক্‌রো ভেঙে যেতে দেখলো স্বচক্ষে। এতে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস মুগ্ধ হয়ে স্যামের পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যেতে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ হাজার ডলার মঞ্জুর করলেন।

জাহাজ উড়িয়ে দেবার কাজের ব্যস্ততার মধ্যে স্যাম তার পানির নীচের তারের (কেবল্) একটা নতুন প্রয়োগের ভালো সুযোগ এবং অধিক কর্মক্ষম জিনিষ লক্ষ্য করলো। 'মাইনে'র কাজে সে এই তারকে ত্রুটিমুক্তভাবে তৈরী করেছিলো। আর তাতেই এ সুযোগটা এসে গেলো। চুম্বক টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা 'স্যামুয়েল মোর্সে'র সঙ্গে সে যৌথ-কারবারের একটা চুক্তি সম্পাদন করলো। পৃথিবীর প্রথম পানির নীচের টেলিগ্রাফ লাইন বসানোর জন্যে এই দুজনে মিলেই একটা কোম্পানী গঠন করলো। তারা 'কোনী' দ্বীপের সঙ্গে 'নিউইয়র্ক সিটি' 'ব্রুকলীন' ও 'নিউ জার্সী'র মধ্যে 'Under Water Cable line Connection' এই অভিনব পথে সংযোগ সাধন করলো। 'কোনী' দ্বীপ থেকে দেখা জাহাজের আগমনের বার্তা এই কোম্পানী তাদের গ্রাহকদের অবগত করাতে সক্ষম হলো পানির তলদেশে টেলিফোনের এই সংযোগ-এর মাধ্যমেই।

এই উভয় প্রচেষ্টাতেই স্যামের প্রচুর খ্যাতি হলো, কিন্তু কোনোটাতেই তার সৌভাগ্য প্রসন্ন হলো না! এক বিরাট নতুনত্ব হিসাবে 'টেলিগ্রাফ কোম্পানী' প্রশংসা পেলো সত্যি, —কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আবারো আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হলো। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ও স্বপক্ষে কোল্টের প্রচেষ্টার প্রশংসা করা সত্ত্বেও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিলেন যে,—"শান্তির সময়ে নৌ-বাহিনীর ঘাঁটিগুলো এবং বাণিজ্যিক পোতাশ্রয়গুলো রক্ষার কাজে এতো মোটা দাগের অর্থ খরচের প্রয়োজন যুক্তিযুক্ত মনে করি না।"

রিভলবারের প্রথম পেটেন্ট পাবার এগারো বছর পরেও, ১৮৪৬ সালে স্যাম নিজেকে 'গীর্জার প্রার্থনা বেঞ্চের ফাঁকে ফোঁকরে লুকিয়ে থাকা ইঁদুরের মতো গরীব' বলে বর্ণনা করেছিলো।

তবে তাকে বেশীদিন এমনি অর্থকষ্টে থাকতে হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের সংযুক্তির ফলে ১৮৪৬ সালের প্রথমদিকে মেক্সিকান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। টেক্সাসে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের তখন অধিনায়ক ছিলেন,—'জেনারেল জ্যাচারী টেলার'। কোল্ট রিভলবার সম্পর্কে তাঁর জানা ছিলো এবং যে ক'জন সামরিক অফিসার সে সময়ে এটার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জেনারেল টেলার তাঁর এক সহকর্মীকে সময় নষ্ট না করে দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন। জেনারেল জ্যাচারী টেলারের উদ্দেশ্য,—কোল্টের সঙ্গে একবার সাক্ষাত করে যতোগুলো সম্ভব তার উদ্ভাসিত পিস্তল, বন্দুক ও রিভলবার জাতের অস্ত্র কিনে নিয়ে আসা।

তখন অবশ্য স্যামের অস্ত্র উৎপাদনের কোনো আর্থিক সঙ্গতি ছিলো না। 'কানেক্টিকাট' —এর এক বন্দুক-কারখানায় কাজটার দায়িত্ব অর্পন করতে বাধ্য হলো স্যাম। এতো বছর যুদ্ধ করার পর অন্য কেউ তার আবিষ্কারের লাভ পাবে এটা তার পছন্দ হয়নি। তাই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পুঁজি জোগাড় করে সে 'হার্টফোর্ডে' নিজেই একটা অস্ত্রকারখানা তৈরির কাজ শুরু করে দিলো। ঠিক উপযুক্ত সময়ে এবং যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে।

এমন কি তখনো হার্টফোর্ডের কারখানা তৈরির কাজ শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই মেক্সিকান যুদ্ধে প্রমাণিত হলো যে, ছয় গুলীওয়ালা বন্দুকের সঙ্গে অন্য কোনোরকম অস্ত্রের একেবারেই তুলনা চলে না। সেনা বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বলেছিলেন,—"প্রচলিত সাধারণ অস্ত্রে সজ্জিত এক হাজার লোক নিয়ে এক হাজার শত্রুর মোকাবেলা করার চেয়ে আমি কোল্টের পিস্তলে সজ্জিত আড়াইশো লোক নিয়ে এক হাজার অস্ত্রধারী শত্রুর সম্মুখীন হতে সুস্থ মাথায় রাজি আছি।"

সত্যি বলতে, সেই থেকে কোল্ট রিভলবার পশ্চিমা অস্ত্রের ইতিহাসের ভুবনে এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে উঠলো। ছয় গুলী ওয়ালার সঙ্গে অন্য কোনো দ্বিতীয় পদ্ধতির অস্ত্রের তুলনাই হতো না—কারণ জঙ্গলে লুকোবার পূর্বে লক্ষ্যভেদ করার জন্যে কোনো লোক অন্য কোনো অস্ত্রে ছ'বার গুলী করার সুযোগ পেতো না। অশ্বারোহী লাল ইন্ডিয়ানকে পরাজিত করার ব্যাপারে জাঁদরেল সমস্ত সীমান্তবাসীগণ কোল্ট-এর রিভলবারকে একমাত্র মনে করতো, যা থেকে অতি দ্রুত গুলী করা যায়।—'কোল্ট রিভলবার' সঙ্গে না থাকলে লাল ইন্ডিয়ানদের এলাকা দিয়ে ডাক বহনকারী অশ্বারোহীরা (ডাক-হরকরা) ভ্রমণ করতে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। তারা বলতো,— 'কোল্ট রিভলবার' না নিয়ে পশ্চিমে যাওয়া আর বুট ও জিন না নিয়ে ঘোড়ায় চড়া একই পর্যায়ের বোকামী হবে।"

যুদ্ধের জন্যে মারাত্মক অস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও 'কোল্ট রিভলবার'-এর নাম, 'শান্তির হাতিয়ার' হিসাবেও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। কোল্টের 'শান্তিস্থাপন কারী' মডেল বাস্তবিকই ভয়ংকর সীমান্ত শহরগুলোর আইন শৃংখলা রক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো। স্যাম তাই বলেছিলো,—"আমার আবিষ্কৃত অস্ত্রধারী কোনো ভদ্রলোক এক ডজন দস্যুকে কাবু করতে সক্ষম; কারণ, তার কাছে ছ'টি গুলী রয়েছে এ কথা জানে বলেই দস্যুরা বলতে পারে না—কার ভাগ্যে কোন্‌টা জুটবে; তাই তারা যে যার পথে সট্‌কে পড়ে, তখন সেই ভদ্রলোককে অবশ্যই কোল্ট রেহাই দেবে।"

১৮৫৫ সনের মধ্যে কোল্টের হার্টফোর্ড অস্ত্র কারখানা পৃথিবীর বৃহত্তম বেসরকারী অস্ত্রগার হয়ে দাঁড়ালো। সেখানে ক্ষুদে পকেট পিস্তল থেকে শুরু করে শক্তিশালী ঘূর্ণায়মান রাইফেল পর্যন্ত নানা ধরনের পুনঃক্রিয়াশীল আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী হতে লাগলো। কোল্টের অস্ত্রগুলো, পৃথিবীর চারদিকে—ইউরোপ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সগৌরবে ছড়িয়ে পড়লো। স্যাম সত্যি-সত্যিই একদিন অবশেষে তার সৌভাগ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হলো। সে এ্যামেরিকার ধনকুবেরদের অন্যতম হয়ে পড়লো মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই।

সাতচল্লিশ বছর বয়সে ১৮৬২ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে তাঁর কারখানার আরো সম্প্রসারণ করেছিলেন। তাঁর অবর্তমানেই তাঁর পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চললো। এদিকে ইউনিয়ন বাহিনীর প্রধান পার্শ্ব-অস্ত্র হিসাবে 'কোল্ট রিভলবার' স্থান পেয়ে গেলো। অনেক অশ্বারোহী সৈন্য—দুটো বেল্টে, আর দুটো জিনের মধ্যে মোট চারটো 'কোল্ট রিভলবার' বয়ে নিয়ে চারগুণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতো। নিজের জন্যেতো বটেই—দেশের জন্যেও।

গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই অস্ত্রে ভীষণ রকম আকার অবয়বের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; কিন্তু আজকাল 'পশ্চিম বিজয়ী বন্দুক' নামে পরিচিত কোল্টের সেই ছয় গুলীওয়ালার মতো পিস্তল ও রিভলবার খুব কম আগ্নেয়াস্ত্রের ইতিহাসের উপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো।

কানেক্টিকাট অঙ্গরাজ্যের মালিকানাধীন কোল্ট রিভলভারের পুরোনো এক মূল্যবান সংগ্রহশালার মাধ্যমে স্যামের জীবনকাহিনীর পুরো পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে,—কাঠের মডেলের সেই ঘূর্নায়মান পিস্তলের অংশ যা স্যাম 'কার্ভো' জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রার সময়ে তৈরি করেছিলেন।

স্যামুয়েল কোল্টের সেই সংগ্রহশালার জন্যে কেবলমাত্র একটা জিনিসই পাওয়া যায়নি—যা আজও সরকার পৃথিবীর সবক'টি দেশে খুঁজে খুঁজে দেখছেন। তা হলো,—এক ডলার মূল্যের যে বড়ো চাকুটা দিয়ে ষোলো বছরের ইয়াংকী যুবক, আজকের বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কর্তা তাঁর সৌভাগ্যের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন,—সেই চাকুটা!